জগন্নাথের খেয়াল-খাতা

GB9682

জগন্নাথ পণ্ডিত লিখিত

ও

শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু বিচিত্রিত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার
প্রথম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬২
মূল্য : আড়াই টাকা

মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ
বোধি প্রেস, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬.

ভূমিকা

বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। তখন নিজেই ছিলাম বালক, খেলাধূলা ও গল্প-শোনায় ছিল সমান উৎসাহ। আমরা ছিলাম তখন এলাহাবাদে, পিতার কর্মস্থলে। খেলার-সাথীর মধ্যে হিন্দুস্থানীই ছিল বেশী, আর গল্প শোনাবার লোকের মধ্যে ছিল একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, বাবার আরদালী। সে যৌবনে ফৌজী সিপাহী ছিল এবং সিপাহী বিদ্রোহে কোম্পানীর বিরুদ্ধদলে যোগ দেয়। আর ছিল বাবার বেয়ারা হিন্দুস্থানী কাহার, সে কৈশোরে কুলীর আড়কাটির পাল্লায় পড়ে ট্রিনিডাড যায়।

খেয়াল-খাতার গল্প ঠিক তাদের বলা গল্প নয়, তবে তাদের জীবনের কাহিনীর ছায়া এগুলির কয়েকটিতেই আছে। ভাষাও তাদের খড়িবোলীর রূপান্তর নয়, বরঞ্চ বাংলাদেশের বনিয়াদী বাড়ির ভোজপুরী দারোয়ানের হিন্দী মিশ্রিত বাংলার অনুকরণ অনেক স্থলে করেছি।

প্রথম গল্পটি আমার অগ্রজপ্রতিম স্বর্গত বন্ধু সুকুমার রায়ের অনুরোধে লেখা হয়, তাঁদের "সন্দেশ" কাগজের জন্য। উহা প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালে। ঐ গল্পের যে ছবি তিনি এঁকে-ছিলেন, তাঁর পত্নীর অনুমতিক্রমে, সেটিই এই খেয়াল-খাতার প্রথম ছবি হিসাবে দেওয়া গেল। সুকুমার রায়ই গল্প লেখায় আমায় প্রথম উৎসাহ দিয়েছিলেন, সে কথা আজ স্মরণ করি।

৬ই মাঘ, ১৩৬২ — জগন্নাথ পণ্ডিত

সূচীপত্র
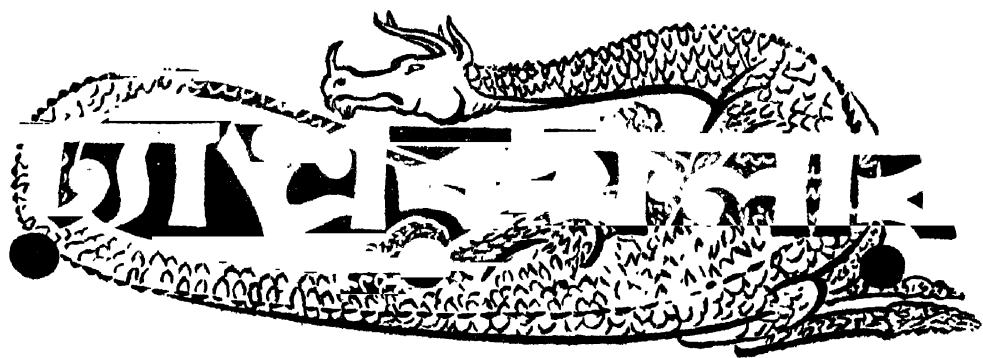
উটফল গাছ এক ঘন যার পাতা
রোদ জল আট্‌কায় ঠিক যেন ছাতা।
নিচে তার বাস করে এক জোড়া ঢ্যাং
দেড় জোড়া শিং মাথে তিন জোড়া ঠ্যাং।
কোন দিন গান গায় কোন দিন খায়
কোন দিন পূজা করে নামাবলি গায়।

এক দিন ঢ্যাং বলে ওরে ঢেঙ্গী ভাই
পেট চলা হোল দায় বনে বাঘ নাই।
চাল বিনে বাঙ্গালীর অবস্থা যেমন
বাঘ বিনে আমাদেরও অবস্থা তেমন।
শুনেছি আছয়ে রীতি মানুষের দেশে
বামুন হলেই পায় খেতে পেট্‌ ঠেসে।
চল্‌ যাই সেথা ধরি বামুনের সাজ
বসে যদি খেতে পাই খেটে কিবা কাজ।
গেলে কিবা খেতে পাব নাহি তা ত জানা
চাইলে পেতেও পারি কচি বাঘ ছানা।

চলেছে সহরে ঢ্যাং খাইতে ফলার
লতা জড়াইয়া করে পইতা তৈয়ার।

হয়েছে বিপুল টিকি বটের জটায়
আস্ত এক বেল গাছ বাঁধা আছে তায়।
"হর হর ব্যোম ব্যোম" শব্দ মুখে ছোটে
মূর্ছা যায় বুনো হাতি আওয়াজের চোটে।
অপরূপ বেশে চলে ঢেঙ্গী তার পিছে
সে রূপ বর্ণন করা চেষ্টা শুধু মিছে।
গণ্ডারের সঙ্গে জোড় মেল ট্রেন গাড়ি
জড়িয়ে পরাও তারে বেনারসী শাড়ি।
সিঁদুরের সঙ্গে মেখে কাদা তিন টন্
লেপে দাও অষ্টে পৃষ্টে, বুঝেছ কেমন?

রাজার মেয়ের বিয়ে বিরাট ব্যাপার
চলেছে বিপুল ভোজ অন্ত নাহি তার।

জগন্নাথ পণ্ডিতের খেয়াল-খাতা

"লুচি দাও," "মাছ কই," "ওরে ব্যাটা চোর,"
"দিবিনা সন্দেশ আর ? পয়সা কি তোর ?"
পাত্র মিত্র সাথে রাজা ঘুরিছেন সেথা
সকলে করিয়া তুষ্ট বলে মিষ্ট কথা।
আচম্বিতে শোনা গেল বিপরীত শব্দ
তরাসেতে সভাস্থল নিমেষেই স্তব্ধ।
গোহালে আগুন লাগে বাজে জগঝম্প
রেলে ভীম কলিসন ঘোর ভূমিকম্প।
মোহনবাগান জেতে দিয়ে দশ গোল
এ সব মিশালে হয় সেইরূপ রোল।
কি যে হোলো নাহি পারে কেহই বুঝিতে
ভরসা হয় না কারো এগিয়ে দেখিতে।

ঢ্যাংএর ফলার

হুড়মুড় করে ক্রমে সভার ভিতর
ছুটিয়া ঢুকিল যত রাজার লস্কর।
"শিগ্‌গির পালান রাজা। এল ঘাঁঘা স্থর
আসিয়া পড়িল বুঝি আর নাহি দূর।"
এইরূপে চারিদিকে লাগাইয়া ভয়
সভাস্থলে আসিলেন ঢ্যাং মহাশয়।
সেই মূর্তি একবার দেখিয়াই চট্
সভাসুদ্ধ লোক দিল বেবাক চম্পট।

যে খাবার পেটপুরে খেত সারা দেশ
সে সকল ঢ্যাং ঢেঙ্গী করেন নিঃশেষ।
কিছুই হ'ল না কিন্তু ঢ্যাংয়ের পছন্দ
কোনটাই নহে ভাল নাহি স্বাদ গন্ধ।
"গণ্ডারের কাট্‌লেট হাতির কলিজা"
"কুমিরের সর্ষেগোলা তিমিমাছ ভাজা";
"কচি বাঘ দিয়ে, আহা, নিরামিষ ঝোল।"
"যত দাও তত খাব করিব না গোল;"
"তা' নয় ব্যাটারা দিল যত ছাই পাঁশ"
"নেমন্তন্ন খেয়ে ঢেঙ্গী হ'লাম নিরাশ;"
"মিঠাই সন্দেশ দই সঙ্গে লুচি-পাঁঠা"
"একি খায় ভদ্রলোকে? মুখে মার ঝাঁটা।"
"মানুষ ব্যাটারা জন্তু!" এই কথা বলে
এঁটো হাতে ঢ্যাং গেল বনে ফিরে চলে।

হে ভাই সন্দেশ যদি তোমার বাড়িতে
ঢ্যাং আসে, খেতে বল কি কি দেবে পাতে।

গল্প শুন্‌বি ? আচ্ছা বলছি গল্প, কিন্তু কথাটি বোলোনা। ভাল গল্প চাই ? তাই বল্‌ছি ; তাই হবে, নতুন রকমের গল্প।

একযে ছিল রাজা। কি বল্লি, "সে খায় খাজা" ? হোলোনা তো। উঁহুঃ, তাও, নয় ; "সে খায় গজা" ও, ঠিক হয় না। "তাঁর হয় গজা", অর্থাৎ কি না তাঁর মাথায় শিং গজায়।

কি করে গজালো ? তা আমি কি জানি। একদিন ভোরে রাজা বিছানায় শুয়ে আছেন এমন সময় রানী হাই তুল্‌তে তুল্‌তে উঠে বসলেন, আর এদিক ওদিক চেয়ে একবার রাজার দিকে তাকিয়েই হুড়মুড় করে, ও রে বাবা রে বলে, লাফিয়ে, নেচে, পালঙ্ক ছেড়ে দৌড়।

রাজা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বল্লেন, "কি হোলো, কি হোলো" ?

রানী বল্লেন, "বিছানায় ইঁদুর উঠেছে নিশ্চয়। নইলে তোমার মাথার বালিশ ছিঁড়ে তুলো ছড়ালো কি করে ? ইস্‌, তোমার মাথায়ও তুলো ভর্তি।

সেই শুনে রাজা তাকিয়ে দেখেন, তাইতো, বালিশ কিসে যেন খাব্‌লেছে। মাথায় তুলো লেগেছে শুনে মাথায় হাত দিয়েই রাজা হতভম্ব। হাতে কি যেন ঠেক্‌ছে চুলের ভিতর।

একটু সামলে রাজা রানীকে বল্লেন, "দাঁড়াও আমি দেখি ইঁদুর কোথায় ! কিন্তু রানীইবা কোথায় ? তিনি ততক্ষণে সাত দাসী সঙ্গে নিয়ে গোসলখানায় মুখ হাত ধুতে গেছেন।

রাজা জানলা খুলে ঘরে আলো আনলেন। তার পর ভয়ে ভয়ে আয়নার কাছে গিয়ে চিরুনি দিয়ে চুল সরিয়ে দেখেন যে মাথায় একজোড়া সরেশ কচি পাঁঠার শিং গজিয়েছে।

এ কোন্ রাজার কথা ? কোথাকার রাজা ? আঃ এতো জ্বালালে দেখ্ছি। গল্প চাস্ না ভূগোলের পড়া চাস্ ?

শোন তবে। যমুনাপারি ছাগল দেখেছিস্ ? ঐ টাট্টু ঘোড়ার মত উঁচু, প্রকাণ্ড ছাগল ? আচ্ছা, সেই রাজা যমুনাপারের মুল্লুকের রাজা। সে এক ভারী প্রকাণ্ড রাজা।

তাঁর হাতিশালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি, গোয়ালে ইয়া বড় বড় গোরু বাছুর ষাঁড় বলদ,

রাজার দিকে তাকিয়েই.........পালঙ্ক ছেড়ে দৌড়

আস্তাবলে মস্ত টগাবগ চালের ঘোড়া—কি ? ও সব জান, সবরাজারই ও রকম আছে ? তাইনাকি, তবে শোন আরো। আর ছিল তাঁর ভাঁড়ার ভরা এই ধেড়ে ইঁদুর, তাঁর দিঘি পুকুরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কোলা ব্যাং, বাগানে লেজঝোলা হনুমান—ঠিক তোদেরই মত।

আর তার ওপরে হোলো তার মাথায় ঐ ছাগলছানার মত দুটো শিং।

বেচারা রাজার তো চক্ষুস্থির, আয়নায় সেই শিং দেখে। তারপর কত চেষ্টা করলে সেই

শিং ভেঙ্গে দিতে কাটতে। কিছু করা গেলনা, মাঝখান থেকে মাথাটা ধরে টানাটানি করে মাথা ধরলো জোর। আর লোকে জানতে পারলে কি হাসাহাসি হবে তাই ভেবে ভেবে মাথা ঘুরে যেতে লাগলো।

সেই দিন থেকে বেচারা রাজার হোলো মহা মুশকিল। পাছে লোক জানাজানি হয়। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়। শেষে আর কি করেন মাথার চুল কাটা বন্ধ করলেন আর দিন রাত মাথায় একটা কিছু পরে বেড়াতেন, হয় মুকুট, নয় পাগড়ি, নয় উঁচু টুপি।

চুল তো বড় হয়ে জট পড়তে লাগলো। রানী বলেন, "অত চুল রাখা আবার কি, সন্নিসী হবে নাকি?" রাজা কিছুই বলেন না হাসেন।

কিন্তু চুল আর কত লম্বা রাখা যায়? লোকে কানাঘুষা আরম্ভ করেছে একথা রাজার কানে পৌঁছাল। রাজা তখন আর করেন কি নাপিত ডেকে একলা বসে, চুল কাটালেন। নাপিত চুল কাট্‌তে গিয়ে দেখে অ্যাঁ, একি! রাজার মাথায় ছাগল ছানার মত দুই শিং। কিন্তু দেখেও সে কিছু বলেনা। রাজাও টের পেলেন যে নাপিত বুঝেছে ব্যাপার।

কিন্তু বুঝলে হবে কি, চুল কাটা হতেই রাজা হাঁক দিলেন প্রহরীকে। সে আস্‌তেই তাকে বল্লেন, "এই বেইমানের মাথা নেও, ও আমার গলায় খুর বসাতে চেষ্টা করেছিলো।" প্রহরী তো তখনই নাপিতকে ধরে নিয়ে, কচাং করে তার মুণ্ডু কেটে নিলো।

শিং জোড়া বেড়ে চল্‌লো, তার আর কোনও উপায় হোলোনা কিছু করার। রাজাও মাঝে মাঝে চুল কাটান। কিন্তু যে নাপিত যায় সে আর ফিরে আসে না; রাজা মশাই কোন একটা ছুতো নাতা করে তার মাথাটি উড়িয়ে দেন। কাজেই আর কোন নাপিত আস্‌তে চায়না। রাজার বাড়ি যাওয়ার হুকুম এলেই কোন রকমে খুর-কাঁচি পুঁটলি-পাটলা নিয়ে তাঁর দেশ ছেড়ে পালায়। শেষে এক ছোকরা নাপিত টাকার লোভে রাজার বাড়ি গেল নাপিতের নাম ছিল ভবম হাজাম (হিন্দুস্থানি নাপিত কিনা,—তারা নাপিতকে বলে হাজাম)।

ভবম এসে ত বেশ করে রাজার চুল কাটছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে কি না রাজার মাথায় —বাপ রে—এয়া বড় দুই শিং! সে ত তাই দেখে একেবারে হতভম্ব। তারপর সে কোন রকমে রাজার চুল কাটা সারল। কিন্তু বেচারার এই সব দেখে মাথা ঠিক ছিল না, সে রাজার মাথায় টিকি রাখতে ভুলে গেল। আর যায় কোথায়? রাজা বল্লেন, "তবে রে বেটা বেয়াদব, আমার মাথায় শিখা রাখিস্ নি যে? এক্ষুনি তোর গর্দান নেব।"

নাপিত ত ভয়ে কাঠ। সে বল্লে, "দোহাই হুজুর, এটা বড়ই ভুল হয়ে গেছে ; তবে টিকি, বিশেষ করে রাজা লোকের টিকি, ও ফের খুব শিগগির গজাবে ; কিন্তু হুজুর, আমি গরিব মানুষ, আমার মাথা গেলে আর গজাবে না"—কিন্তু সে আর কে শোনে ? তারপর নাপিত অনেক হাতে পায়ে ধর্‌ল, শেষে বুঝিয়ে বল্ল যে, তার মাথা কাটা গেলে আর কোন নাপিত কখনো রাজবাড়িতে আসবে না। তখন রাজা আর কি করেন, বল্লেন, "যা, কিন্তু খবর্দার আমার শিংয়ের কথা কাউকে বলিস্‌নে, বল্লেই তোর দফা শেষ করব।"

নাপিত ত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মেরে পালাল আর রাজার বাড়ির মুখোও হল না।

এখন, নাপিতের পেটে কথা থাকে না। কাজেই এই রাজার শিংয়ের কথাও ভবম নাপিতের পেটে আর থাকতে চায় না। নাপিত প্রাণের দায়ে তাকে জোর জবরদস্তি করে অনেক চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু সে কিছুতেই চাপা গেল না, মাঝে থেকে এই ঠেলাঠেলির চোটে ভবমের পেটটা ফুল্‌তে লাগ্‌ল। দিন যায়, নাপিতের পেটও যায় যায়।

সেটা ফুলে ফুলে ঢোল, ক্রমে ঢাকাই জালা হয়ে উঠল। শেষে নাপিত তার এক নানির (দিদিমা) কাছে গেল। গিয়ে বল্লে, "নানি, টাকার লোভে এক জায়গায় গিছলাম, সেখানে একটা কথা জেনেছি ; এখন তার চোটে মাথা যায় কি পেট যায়"।

নানি বল্লে, "কি হয়েছে খুলেই বলনা কেন ?" ভবম্‌ বল্লে, "সে তো বলবার যো নেই আর না বল্লেও ত দেখ্‌ছই কি হচ্ছে"।

নানি তখন তাকে বলে দিল যে, "শহরের মাঝে যে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে তার কোটরে ঢুকে তোর কথাটা বলে আয়গে"। ভবম তখন গাছের কোটরে ঢুকে চুপে চুপে ব'লে এল "আরে বাস্‌ রে, রাজার, মাথায় এয়া বঁড় দুই শিং!!" আর অম্‌নি তার পেট ফাঁপাও সেরে গেল।

তারপর একদিন রাজার বাড়ি মহা ধুমধাম। রাজার মেয়ের বিয়ে। অনেক জায়গা থেকে কত ঢাক ঢোল কত বাজনা এসেছে। তার মধ্যে ছিল এক ঢোল সেটা শহরের মাঝের বটগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। যখন বিয়ের আসর খুব জমেছে, বরযাত্রী এসে পড়েছে, চারিধারে লোকে লোকারণ্য, তখন সকলে শুনল, রাজার নহবতখানায় শানাই কাঁসর আর ঢোল মিলে নানান সুরে কি যেন বল্‌ছে। শানাই তার মিহি সুরে তান ধরেছে, "রাজাকে দুই শিং

রাজাকে দুই শিং"! কাঁসর অমনি ক্যান ক্যান করে বলছে, "কিয়ে কহা? কিয়ে কহা?" (কে বলে, কে বলেছে), আর ঢোল গুরু গম্ভীর আওয়াজ করে বল্‌ছে "ভবম হাজাম্ নে, ভবম হাজাম্ নে" (ভবম নাপিত বলেছে)।

আর কোথা যায়। চারিধারে হুলস্থুল—লোকে যা তা বলতে আরম্ভ করল। রাজা ত রেগে আগুন হয়ে নাপিতকে কাটতে হুকুম দিলেন। কিন্তু নাপিত কি আর সেখানে থাকে? সে সেই সর্বনেশে ঢোলের কাণ্ড দেখে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। কাজেই, তাকে আর তখন ধরে কে? রাজামশায়ের লম্ফ-ঝম্ফ আর শিং নাড়াই সার হ'ল।

শাহ্ চুকন্দর

রবিবার ছুটির দিন। মণ্টুদের বারান্দায় বিরাট মজলিস বসেছে, কোথাও গুলতন কোথায়ও তর্ক চলেছে জোর। বড়দের দলে চল্‌ছে কিছু পলিটিক্‌স্‌ কিছু টেস্টম্যাচ, কেউবা রঞ্জী ট্রফির খেলা নিয়ে ধুম তর্ক জুড়েছে। মণ্টু মাস্টারের দল, অর্থাৎ মণ্টু, লালু আর গণেশ এই তিন ভাই আর তাদের দুই বন্ধু কালু আর বুড়ো, সম্প্রতি বক্সিং নিয়ে মেতেছে, তাই বক্সিং ফেস্টিভ্যালে লড়িয়েদের চান্স নিয়ে খুব গম্ভীরভাবে জল্পনা কর্‌ছিল। চা আর পানের ছড়াছড়ি, বড়দের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীও উড়ছিলো। চতুর্দিকে হাত, নড়ছে, মাথাও নড়ছে, মুখ তো ছুটছেই, শুধু বারান্দার এক কোণে, মণ্টুদের দিকে, সিঁড়ির ওপর পা মেলে, দারোয়ানদের জমাদার বুড়ো রামগিরধারি সিং—ওরফে রামগিদ্ধড় সিং—নিবিষ্ট মনে, চুপ করে, খইনি ডল্‌ছিলো। সে যে কারুর কথা শুনছে তা মনে হচ্ছিল না, তবে মাঝে মাঝে মোটা চশমা পরা চোখ দুটো ছেলেদের উপর ঘুরে যাচ্ছিল। দারোয়ানজী মণ্টুর ঠাকুরদার আমলের লোক, ছুটি-পেন্সনের সময় অনেক দিন হয়ে গেছে, কিন্তু দেশে মন টেকেনা তাই তিন চার মাস দেশে থাকে, বাকী সময় থাকে মণ্টুদের বাড়িতে।

বড়দা বল্লে, "বেলা তো প্রায় দশটা হতে চল্‌লো, আজও ভুলুবাবুর দেখা নেই।" ভুলুবাবু মণ্টুদের দূর সম্পর্কে ভাই, ওদের ওখানেই থেকে পড়ছিল। সম্প্রতি কিছু দিন হোলো, দেশ থেকে বাবা, মা, কাকা, কাকী সবাই চলে এসে কলিকাতায় পার্ক সার্কাসের দিকে বাড়ি

নেওয়ায় সেখানে গেছে, তবে ছুটির দিন বা খেলার দিন সে বরাবর এই মজলিসে আসে আর সভা গুলজার করে।

সবাই বল্লে, "তাই তো, সে গেলো কোথায় ?" বল্‌তে বল্‌তেই গণেশ চেঁচিয়ে বল্লে, "ওই তো, ভুলুদা আসছে ; সবাই তাকিয়ে দেখলে ভুলুবাবু অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে বারান্দায় এলো এবং এসে অত্যন্ত হতাশ ভাব দেখিয়ে বসে বল্লে "এক কাপ চা।"

দেখে মনে হোলো যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে !

ভুলুবাবু ফুর্তিবাজ লোক, ক্রীকেট থেকে ক্যারোম, পলিটিক্‌স্‌ থেকে সিনেমা, সব কিছুতেই সে একজন সবজান্তা ! তার এই অবস্থা দেখে সকলের তাক্‌ লেগে গেল !

চা এলো, চায়ে এক চুমুক দিয়ে, সে বড়দার সিগারেটের টিনটা টেনে নিল। টিন ফাঁক হয়ে গেছে দেখে সে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চায়ে চুমুক দিল, একটা কথাও বল্‌ল না।

বড়দা অবাক হয়ে বল্লেন, "তোর হোল কী ?"

খুব উদাসভাবে উত্তর এল, "বাড়ি খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি।"

"সে কিরে ? এই তো মাত্র সেদিন ঐ বাড়িতে তোরা গেছিস। বাড়িওয়ালা গোলমাল বাধিয়েছে বুঝি ?"

"নাঃ।"

"তবে কি, পাড়ার লোক ?"

কে একজন বলে উঠলো, "তা যাই বলো, পার্ক সার্কাসের আশপাশ খুব সুবিধের নয়। ট্যাস-ফিরিঙ্গি, পৈতি-মুসলমান আর রেফিউজি তো আছেই।"

ভুলুবাবু একটু বিরক্তির সঙ্গেই বল্লে, "ওসব কিচ্ছুই নয় !"

বড়দা বল্লে, "তবে কি হয়েছে তাই বল্‌ না !"

ভুলু অস্পষ্টভাবে বল্লে, "ভূত।"

"অ্যাঁ, কি বল্লি ?"

এবার স্পষ্ট উত্তর এলো, "ভূত।"

"ভূত ?"

জোর গলায় উত্তর এলো, "হ্যাঁ, ভূত !" তারপর একটু থেমে, "যাকে বলে মাম্‌দো ভূত।"

এক মুহূর্তে চারিদিকে কথাবার্তা থেমে গেলো। দশ পণেরো সেকেণ্ড লাগলো সবার

সাম্‌লে উঠতে। তারপর উঠলো চতুর্দিক থেকে অবিশ্বাসের হাসি ও চিৎকার, "বোগাস্‌", "গুল," "ইয়ারকি মারার জায়গা পাওনি"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এতো চেঁচামেচি সত্বেও ভুলুবাবুর সেই উদাস, নির্লিপ্তভাব—যেটা তার পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক—রয়ে গেল। খানিক পরে, গোরগোল কম্‌লে সে ধীরে ধীরে বল্‌ল, "তোরা তার বুঝবি কি! হোতো তোদের আমার মত হাড়-কালি, বাড়ি খুঁজে।"

বড়দা এবার চটে বল্‌ল, "তুই এই দিনে দুপুরে, এই চুনের চার দেওয়ালের মাঝে দাঁড়িয়ে বল্‌তে চাস্‌।"

বড়দার বন্ধু নরেশ, হিস্ট্রির রিসার্চ স্কলার, "পাথুরে প্রমাণ" ছাড়া কথা কয়না, বল্লে, "না দিন-দুপুর নয়, সকাল; আর বারান্দায় তিন্‌টে দেওয়াল—"

বড়দা একটু ঝাঁজের সঙ্গে বল্লে, "যা-যাঃ থাম্‌। ও আমাদের পেয়েছে কি, যে এরকম গুল-গাঁজা"—

ভুলু বল্লে, "যা তুই জানিস্‌ না, বুঝিস্‌ না, সে সবই গুল"—

"তুই এখনো বল্‌বি তোদের বাড়িতে ভূতের উৎপাত চল্‌ছে?"

"আলবত্ত বল্‌বো।"

"তুই নিজে দেখেছিস্‌?"

এবার ভুলু যেন একটু দমে গেল। বল্লে "না তবে আর সকলেই দেখেছে"—

বড়দা বল্লে "আর সেই শোনা কথা তুই ফলাও করে আমাদের বল্‌তে এসেছিস?"

নরেশ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্লে, "শোনা কথায় না কোরো প্রত্যয়।"

ওদিকে হীরেনবাবু এতক্ষণ উস্‌খুস্‌ কর্‌ছিলেন। তিনি আর্টিস্ট লোক, কবি লোক সুতরাং একটু অন্য ধরনের। তিনি বল্লেন—

"ব্যাপারটা কি একটু শোনাই যাক না। অত তর্কের প্রয়োজনটা কি? বলুন তো ভুলুবাবু" এই বলে তাঁর সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলেন। ভুলু একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু স্থির হয়ে বস্‌লো। ইতিমধ্যে সবাই এগিয়ে বস্‌ল ব্যাপারটা শুনবার জন্য। দারোয়ানজী ভূতের নাম শুনেই এদিকে মুখ ফিরিয়ে শুনছিল, এখন পাকা গোঁফজোড়া ফাঁক করে, মুখে খইনি ঢেলে, এদিকে ঘুরে বস্‌লো।

ভুলু বল্লে, "ও বাড়িতে যাবার পরেই মা বলেছিলেন তাঁর কিরকম একটা খট্‌কা লেগেছিল। নতুন ঝক্‌ঝকে বাড়ি, এতো খরচ করে চাঁপাডাঙার জমীদার বাবুরা করুল, তারপর ছ'মাস

যেতে না যেতেই বাড়িটা ছেড়ে ফিরে গেল দেশে। ভাড়াও যে তেমন বেশী তা নয় আজকালকার হিসেবে। সেলামী-টেলামী ও চাইলো না। মা বলেছিলেন তখনিই কি জানি বাবু বাড়িতে কোনও উপদ্রব নেই তো!' তখন আমরা সকলেই হেসেছিলাম।" বলে ভুলু একবার বড়দার দিকে তাকালো। হীরেনবাবু বল্লেন—"তারপর?"

"তারপর? তারপর ক'দিন যেতে না যেতেই প্রথমে ঝি-চাকর, পরে মেয়েদের মধ্যে একটা কানাঘুষো চল্‌তে লাগলো। রাতের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন কে একটা সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, কখনো সিঁড়িতে, কখনো একতলায়, কখনো তেতলায়। গোড়ায় সবাই চেপে যেতো বোকা বনবার ভয়ে।"

"প্রথম গোল বাধালো একটা চাকর। সে খেয়ে দেয়ে বৈঠকখানার ঘরে শুতে গিয়েছে তখন অনেক রাত। বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে জানলা সব খোলা, দিব্যি চাঁদের আলো আস্‌ছে। আর সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে কে এক মস্ত লম্বা চওড়া বুড়ো, সাদা কাপড়, সাদা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, হাঁটু মুড়ে, বৈঠকখানায় জাজিম-পাতা তক্তাপোশের উপর দিব্য নবাবী চালে বসে আছে। সে চেহারা দেখে চাকর ব্যাটা তো চম্‌কে 'আঁউ আঁউ, কে কে' বলে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চেঁচাল। আমারা উঠে ছুটে নিচে গিয়ে দেখি, ব্যাটা তো নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে। কি হয়েছে জিগ্যেস করতে বল্‌ল, 'ওই, ওই, সে—ওখানে বসেছিল, আমি ডাকাডাকি করতে ভিরকুটি মেরে তাকালো, তারপর উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে জানলার গরাদ দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল।' তারপর দিনই চাকর উধাও মাইনেও নিলো না, আর আমরা ভেবেছিলাম ব্যাটা হয়ত কিছু হয়ত কিছু হাতিয়ে গেছে, তাও কিছু নেয়নি।"

"এর পর তো সবাই দেখ্‌তে লাগল নানারকম। কাকাবাবু তো একদিন মাঝরাত্রে 'চোর চোর' বলে বাড়ি মাথায় করলেন। সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলে, তাঁর খাটের মশারি ছেঁড়া, তিনি বাতি জেলে দোরগোড়ায় লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন, আর কাকীমা ঘরের কোণে গালে হাত দিয়ে জড়সড়। একটু ঠাণ্ডা হতে বল্লেন যে, তাঁরা বাতি নিবিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। মাঝরাতে কাকীমার কিরকম একটা অসোয়াস্তি হয় মনে হয়, ঠিক যেন ঘরে কে ঢুকেছে। মাথা ফিরিয়ে তিনি দেখেন যে, ঘরের খোলা জানলার ধারে কে একজন সাদা কাপড়জামা পরা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারার আলোয় আবছায়া চেহারা দেখা যাচ্ছে। দারুণ ভয় পেয়ে কাকীমা তো কাকাকে ঠেলে তোলে। কাকা উঠে হাঁ হাঁ করতেই সেই লোকটা যেন বিছানার দিকে এগিয়ে এলো। কাকা চোর ভেবে 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়ে, লাফমেরে মশারি ছিঁড়ে বেরিয়ে

শৈলেন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে……আর পারুল বাবাগো মাগো বলে চেঁচাচ্ছে

লাগলো। তার রকম দেখে ছোটোর দল একটা গল্পের আঁচ পেয়ে তাকে ঘিরে বসলো। মণ্টু মাস্টার দারোয়ানজীকে জিগ্যেস কল্লে, "আচ্ছা জমাদার, তুমি কখনো, ঐ যে কি বল্লে সহিসমন্দ না কি, ওরকম কিছু দেখেছো ?"

দারোয়ানজী একটু স্নেহ-মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে, "আরে আমি তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুন্‌তে শুন্‌তে বুঢ়া হয়ে গেলো, হামার কাছে ওসব কি নতুন কিছু আছে ?"

গণশা বল্লে, "বলনা একটা গল্প।" লালুও সায় দিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলনা জমাদার।"

দারোয়ান একবার তাদের উৎসুক মুখগুলি দেখলো, পরে বড়দের দিকে একটু ভ্রূকুটি হেনে সোজা হয়ে বসে বল্লে, "অচ্ছা, তবে শুন্।" সব্বাই এগিয়ে বসলো। বড়রাও না-শোনার ভান করে শুনতে লাগলো।

—"সে অনেক দিনের কথা। আমাদের মুলুকে এক বড়া ভয়ানক লড়াই হোয়ে গেলো, যাকে আমরা বলি গধর্ আর দিহাতি লোকে বলে গল্‌বা। লড়াই সব্‌সে ভয়ানক হোলো যমুনাজী আর গঙ্গাজীর মাঝের দুআব ইলাকায়, আর হোলো গুম্‌তি নদীর পাশে লক্ষ্ণৌর কাছে।"

মণ্টু জিগ্যেস করলে, "এ কদ্দিন আগের কথা ?"

"সে বহুত দিন আগে। উন্নিশ শো বারো কি তেরো শো বরস্ আগে হোবে।"

মণ্টু বল্লে, "উনিশ শো চৌদ্দের লড়াই ? সে তো বিলেতে, ইয়োরোপে।"

গণেশ বল্লে, "সেই সময় আগ্রায় না দিল্লীতে যে কি একটা হয়েছিল।"

কালু বল্লে, "আরে দূর। জালিয়ানওয়ালাবাগ, সে তো লাহোর না অমৃতসরে। জমাদার কোনও দাঙ্গার কথা বলছে ?"

দারোয়ানজী বিরক্তভাবে বল্লো, দাঙ্গা-সঙ্গা নয়, লড়াই। তোপ-তমঞ্চা, বন্দুক-তলওয়ার, পল্টন-রিসালা, ঘোড়া-উঁট এইসব দিয়ে লড়াই। ফৌজে ফৌজে, গোরা পল্টনে সিপাহীতে।"

মণ্টু জিগ্যেস কল্লে, "বড়দা, উনিশ শো বারো তেরোতে গঙ্গা-যমুনার মাঝে কি কোনও লড়াই হয়েছিলো ?"

দারোয়ানজী এবার রেগে বল্লে, "হাঃ। উ কি জানে ? হামার বয়েস চার কুড়ি সাত বরস্ হোয়ে গেলো, হামার জনমের আগের লড়াই, ও কি জানে। আমি শুনেছে মা মৌসী বুয়ার কাছে, বাপ দাদা বলেছে কহানী।"

বড়দা আড়চোখে একটু হেসে বল্ল, "দারোয়ান অঙ্কে একেবারে আইনষ্টাইন! উনিশ শো চৌদ্দ, আর আজ উনিশ শো তিপ্পান্ন। এর মধ্যে চারকুড়ি সাত বচ্ছরের বুড়োয় থই পায়না।—কে কার সঙ্গে লড়েছিল জমাদার?"

ঠাট্টাটা বুঝে দারোয়ানজী একটু ঝাঁজের সঙ্গে বল্লে, "হাঁ হাঁ। তুমি আজ বড় বিদ্‌ওয়ান হয়ে গেলো। এই সো দিন তো আমার লাঠি নিয়ে ঘোড়ার সোয়ারী করেছো, তার আগে তোমার বাবাও সেই লাঠি পর সওয়ার হয়েছে। আজ তুমি লায়েক!"

"আরে চটো কেন ছাই। তোমার গদ্ধড়ের লড়াইয়ে লাট-বাদশা, কাপ্তান কেউ লড়েছিল?"

"হাঁ লড়েছিল দিহ্‌লীর বাদশার তর্‌ফে পিশ্‌বা ধঁদুপন্ত, টাঁটিয়া টোপে, অঁওর সিং কুঁয়র সিং।"

গণেশ বল্লে, "বাপস্! কি সব নাম।"

হিস্ট্রী-স্কলার নরেশবাবুর এতক্ষণে হুঁস হোলো, তিনি বল্লেন, "থামো তো দেখি তোমরা একটু। ধঁদুপন্ত নামটা যেন চেনা। আচ্ছা জমাদারজী এটা কতো সাল?"

"এখন? এটা দো হাজার দশ সাল। আর, আমি সেই গধরের কথা বলছি যাতে হিন্দুস্থানের লাখ লাখ মরদ কম্পানী বাহাদুরের তোপের মুখে ঝাঁপিয়ে জান দিলো। শুধু মরদ কেন, যমুনা পারে, ঝাঁসীর রানী লছমীবাই লড়াই লড়ে জান দিলে। হায় হায়, 'ঝাঁসী গলে কি ফাঁসি চন্দা গলে কি হার'—ওদিকে লড়লো হেভলক্ সাহাব, লোরিন সাহাব, হুরুজ সাহাব"—

নরেশবাবু চেঁচিয়ে বল্লেন, "বুঝেছি, সিপাই মিউটিনী।"

মণ্টু বল্লে, "জমাদার ওদের কথা শুনোনা। কি হোলো, তুমি গল্প বলতে থাকো, ওরা কিছু জানে না"—

সবাই বল্লে, "হাঁ হাঁ বল, বল।"

দারোয়ানজী একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগলো, "লড়াইয়ে কতো লোক মরে গেলো। কত লোকের ফাঁসি হোলো; হাত পা কাটা গেলো। কতো নবাব ফকীর হোলো, কতো বেইমান আমীর হলো, ওহ্ হো, হো"—

কালু বল্লে, "সে তো সব বইয়ে লেখা আছে, কিন্তু ভূতের কথা"—

"আরে, বহি কিতাবে তো সব ঝুটা কথা লিখা আছে। যদি হামার দেশে তোপখানা

থাকতো, তবে ঐ দিনই অংরেজী-রাজ মিট্ যেতো। সব তো ফতা করলো কম্পনী বহাদুরের তোপখানায়, নহিলে গোরা কি জানে লড়াইয়ের" —

মণ্টু এবার একটু অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, "হাঁ হাঁ, সে সব ঠিক, কিন্তু ভূত ?"—

"অরে বাবা, বলছি ভূতের কিস্‌সা। শুন্ তবে"—

"হামার দেশের রাজা ছিলো ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং! চালিশ গাঁওয়ের রাজা, তার কতো জমিন, ক্ষেত, গোরু, বয়েল, হাতি, ঘোড়া, ভঁইস, বকরি। কী ধনদৌলত ছিল দেশে সেই রাজার ভাণ্ডারে!"

"আমাদের গাঁওয়ের লাগাই ছিল তার রাজবাড়ির মেহাল। বাগ-বাগিচা ফুল-ফুলওয়ারী, তাল-তলাও, তার মাঝে ইট পাথরের মেহাল, পাথর বাঁধানো আঙিনার পারে অন্দরের মহল। পাশে হাতির পিলখানা, ঘোড়ার আস্তাবল, আর পেছনে গোরুর গোয়ালে শও দেড়শো গরু।"

"তার শেরওয়ালি দরওয়াজায়ে ছিল নহবত; কি শাহনাই বাজতো দিনরাত! আওর পিয়াদা, সিপাহী সন্ত্রী সওয়ার—ওহ্ হো হো কি দিন ছিলো তখনকার—"

"তারপর এলো গধর্। শুরুতে ঠাকুর সাহাব তো কোনও তরফে ভিড়লো না, বল্লে, 'আমি প্রজা-রাইয়ত্‌কে আফদ্ বিপদে ফেলতে চাই না।' চারিদিকে খুব সোরগোল লেগে গেলো কিন্তু হামার দেশের লোক চুপ্‌চাপ নিজের কাম-কাজে রয়ে গেলো।"

"যখন পিশ্‌বা নানা সাহাব কানপুরে গোরা পল্টনকে ফতা কোরে, সাহাব-মেমদের কেটেকুটে, কল্যাণপুর হয়ে হামার গাঁওয়ের দিকে এলো, তখন লোকজন সকলে বল্লো, কম্পনীরাজ খতম হয়ে গেলো, এখন যে পারে রাজ দখল করতে সেই রাজা কি বাদ্‌শা হোবে।"

"হামার দেশেও মাথা গরম জোয়ান লোক বহুত ছিলো। তারা বল্লে, 'চলো লক্ষ্ণৌ, চলো গাজীপুর, যৌনপুর। চলো দিহ্‌লী, ভাগিয়ে দাও অংরেজ-ফিরিঙ্গিকে।' লড়াই-জঙ্গের নেশায় সব ক্ষেপে গেলো। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে কম্পনীর ফৌজের ব্রাহ্মণ সিপাহী নিমক-হালাল ছিলো। তারা জবরদস্ত লড়াই লড়্‌ল, আর বেলী গারদের তোপখানাও জোর চল্লো। লক্ষ্ণৌ দখল হোলো না। তারপর এলো হেভ্‌লক সাহেবের শিখ রিসালা, গোরখা পল্টন, মাদ্রাজী সিপাহী। আরো পরে এলো গোরা পল্টন, সেই সঙ্গে তোপখানা; তোপখানায় দেশ ভরে গেলো। তোপের সামনে তলওয়ার বন্দুক কী দাঁড়াবে? হাজারে হাজার বহাদুর জঙ্গী-জোয়ান উড়ে-পুড়ে গেলো, ভেঙ্গে গেল সিপাহীদের ফৌজ।"

"হাওয়া বদলে গেলো! পাল্টা বদলা নিলো অংরেজ। মেরেকেটে, তোপে উড়িয়ে, ফাঁসিতে লটকে, দেশে বহিয়ে দিলে খুনের সোত। জোয়ান লোকের জান বাঁচানো হোলো মুশকিল, যে যেখানে পারলো ভেগে গেলো। যারা কম্পনীর ঘেরায় পড়্‌লো তারা সব মর্‌লো, কেউ জঙ্গের ময়দানে, কেউ গাছের ডালে ফাঁসিতে লটকে।"

"সেইরকম কিছু লোক, যার মধ্যে কিছু ছিলো মোগল সুবাদারের জঙ্গী সিপাহী আর কিছু মামুলী লোক, সব এসে হাজীর হোলো ঠাকুর সাহেবের মেহালে। বল্লে, 'অন্নদাতা জান বাঁচাও।' ঠাকুর সাহেব হিন্দু-রাজপুত, যে লোক শরণ মেগেছে তাকে ফিরাবে কি করে? সর্বনাশ হবে জেনে-বুঝেও রেখে দিলে তাদের।"

"এলো তাদের পিছনে কম্পনীর ফৌজ। ঠাকুর সাহাবের উপর হুকুম হোলো— হাজির হও কাপ্তান সাহেবের সামনে, তোমার মেহালের মরদ্‌-জেনানা, বাচ্ছা-বুঢ়া সকলকে নিয়ে।"

ঠাকুর সাহেব বল্লে, "আমি সকলের হয়ে জবাবদিহি করতে রাজী, হাজির হতেও রাজী। কিন্তু আমার পরিবার, খানদান, প্রজা-রাইতের উপর জুলুম যেন না হয়।"

"কড়া হুকুম হোলো 'অভি সব কো হাজির করো' কম্পনী বহাদুরকো হুকুম।"

"জবাব গেল, 'অন্যায় হুকুম। নহী মানেঙ্গে'!"

"কম্পনীর ফৌজ মেহাল দখলে এগোলো। ঠাকুর সাহেবের লোক-লস্কর লড়ে গেলো মরিয়া হয়ে। তাদের তলোয়ার-ভালা-বন্দুকের সামনে কম্পনীর ফৌজ আগে চলতে পারল না। তারপর এলো তোপখানা। দিবারাত গোলা বর্ষাতে লাগলো। দিওয়াল-দরওয়াজা চুর হয়ে গেল। তোপের সঙ্গে লড়াই কে করে?"

"শেষে এক অমাবস্যার রাতে ঠাকুর সাহাবের সমস্ত লোক দুইদল হয়ে তৈয়ার হোলো। একদল ঝাঁপিয়ে পড় লো অংরেজের তোপখানার উপর. মেরে কেটে লড়ে শেষ বুঁদতক খুন দিল জঙ্গের ময়দানে। অন্যদল মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে, কম্পনীর ঘেরা ফেড়ে, নালা নদীর পথে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিছু লোক বেরিয়ে গেলো; যারা ধরা পড়লো লড়ে মরলো, নইলে ফাঁসি গেলো।"

"মেহাল প্রেতপুরী শ্মশান হয়ে গেলো। শুধু রাজবাড়ির সামনে শিবমন্দিরের চূড়া জেগে রইলো, কিন্তু তার মিঠা ঘণ্টার আওয়াজও বন্দ হয়ে গেলো।"

"এ সব তো হোলো হামার জন্মাবার আগে। আমি কাহানী শুনেছি মা, বাপ, মেসো পিসীর কাছে। আমি যখন দৌড়ঝাঁপ, ডাণ্ডাগুলি খেলতে শুরু করলাম, তখন থেকেই দেখলাম

ঐ রাজবাড়ি জঙ্গলের মাঝে ইট-পাথরের টিলার মত। তার চারিদিকেই ঝোপঝাড়; মেহালের ভিতরও শুকনো পাতা, খড়-কুটা, ঝড়ে-পড়া গাছের ডাল-পাতায় ভর্তি। বাগানে ভাল ফলের গাছ ছিল, আম, পেয়ারা, লেবু আরো কতো কি, কেউ যেতো না তুলতে। মেহালের ভিতর কত কি জিনিস ছিল। লোকে বলতো সোনা চাঁদির বাসন, রেশমপশমের কাপড়, গালিচে ঘরে ঘরে ছিল। কেউ যেতো না সেসব নিতে।"

"এক তো দেশের লোক ঠাকুর দিগ্বিজয় সিংয়ের নামে কাঁদতো; অমন রাজা অওর কুথাও হয় না। তারপর ছিল জংলী জানোয়র সাপের ভয়। সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল ভূত-পিচাশের। দু'চার জন লোক লোভে পড়ে কখন সখন যেতো রাজবাড়ির আঙ্গিনা পার হয়ে অন্দর মেহালে। আঙ্গিনার সামনের দিক তো কম্পনীর গোলাবারিতে চুর হয়ে গিয়েছিল, তার ইট-পাথরের ঢিপির উপর গাছ-পাতার জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল পার হয়ে অন্দরে যে গিয়েছে সেই দেখেছে ভূত, কি শুনেছে পিচাশ-দানোর হো-হল্লা হাঁসি! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যে এসেছে সে দু'বার আর যায় নি।"

"কম্পনীরাজ চলে গেলো। মালিকা মহারানীর রাজ এলো। ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং তো মরেছিল সেই অমাবস্যার রাতের লড়াইয়ে। তার ছেলে ঠাকুর নারায়ণ সিং অনেকদিন ঘুরে ফিরে তারপর বড়লাটের দরবারে আরজি দিলো বিচারের জন্য। বিচারে ফিরে পেলো তার জমিজায়গীর। তখন সে এলো আবার হামার দেশে, সঙ্গে নিয়ে লোকজন মেয়ে ছেলে সব।"

"কিন্তু রাজবাড়ির চেহারা দেখে বড় রানীমা রাজী হোলোনা সেখানে যেতে। বল্লে, জানোয়ার তাড়িয়ে বসতে পারে রাজপুত। কিন্তু ভূত প্রেত দানো, সে কি করে তাড়াবে?"

"রানীমার হুকুম হোলো, যে মেহাল থেকে ভূত তাড়াবে সে পাবে হাজার টাকা আর রানীমার মোতীর মালা। দূর, দূর দেশে খবর গেলো সেই কথার। কত দেশ থেকে এলে কত ব্রাহমন পুরোহিত, ওঝা-রোজা পাণ্ডা, কত সাধু সন্ন্যাসী বৈরাগি সকলে হার মেনে গেলো। পূজা-পিণ্ডা সবই বেকাম হেলো।"

"শেষে বনারস থেকে এলো মহাপণ্ডিত, ওঝার সেরা, দর্শন চৌবে। সাতদিন সারারাত পূজাপাঠ যাগহওন্ সব করলো বড়া জোরসে। দশ মন আটা, পাঁচ মন ঘি, খরচ হয়ে গেলো ব্রাহ্মণ ভোজন আর প্রসাদ বাঁটায়। কিন্তু যখন সবশেষে চললো সে রাজবাড়িতে তখন আর সব রয়ে গেলো, শুধু চল্লো গঙ্গাজলের লোটা হাতে চৌবেজী আর তার পিছনে রাম নাম জপতে জপতে চললো দুই চেলা।"

"যেখানে শেরওয়ালি দরওয়াজা ছিল রাজবাড়ির, সেখানে ছিল তখন একটা ইট-পাথরের টিলা আর তার পাশে বড়া ভারী এক পিপ্পলের গাছ। লোকে দাঁড়িয়ে কি গাছে চ'ড়ে দেখতে লাগলো, চৌবেজী মহারাজ খড়ম পায়ে উড়ানি গায়ে সোজা আঙিনা পার হয়ে খট খট অন্দর মেহালের চৌড়া সিঁড়ি চড়ে উপরে যাচ্ছে। তার পিছনে দুই চেলা চলেছে এদিক ওদিক তাকৃতে তাকৃতে।"

"চেলা নিয়ে চৌবেজী অন্দর মেহালের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। হঠাৎ সবাই শুনলে হোঃ হোঃ ; হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল যেন পচাশ-ষাটজন জোয়ান। তারপর ঠিক পাগলা উঁট যেমন গরজায় তেমনি শুনলো সবাই, 'উব গুব্ গুব্, গাঁ অঁা অঁা'।"

সেই সঙ্গে দেখলো সবাই চেলা দুটো বানরের মত লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে দৌড়ে পালিয়ে আসছে চিল্লাতে চিল্লাতে, 'চৌবেজী তো হো গয়ে, হায় হায়—' সকলে বল্লে, 'হায় হায়, দর্শন চৌবে মরে গেলো'। এমন সময় দেখা গেলো চৌবেজী লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেয়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে থামে জোর ধাক্কা লেগে দুই ডিগবাজী খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়লো। পড়েই লাফিয়ে উঠে সে 'রাম হো রাম হো' বলে ডাক ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালিয়ে এলো। সকলে দেখলো তার সারা বদন দিয়ে খুন বইছে, কাপড়চোপড় ছেঁড়া মুখে গায়ে চোটের দাগ, যেন সে জংলী ভঁইসের সাথে লড়ে এসেছে।"

"ফিরে এসে চৌবেজী তিন লোটা জল খেলো। তারপর একটু দম নিয়ে চেলাদের বল্লে—'চল্ বনারস'। বলে গাঁঠরা-গাঁঠরি বেঁধে সে তৈয়ার হোলো ফিরে যেতে, কারুর কথা শুনলো না।"

"বড় রানীমা যখন এসে অনেক বল্লেন তখন সে বল্ল—'ই হামার কম্ম নয়। ভূত আমি ফুঁক দিয়ে তাড়াতে পারি, পিরেত তাড়াতে পারি গঙ্গাজলের ছিটায়, পিচাশ ভাগাতে পারি আমি মন্তরের জোরে, কিন্তু এ যে শহিদ-মুর্দ, দানো হঁয়ে দল নিয়ে বসেছে।"

সকলে বল্লে, "কি করে বুঝলেন চৌবেজী?"

চৌবেজী বল্লেন, "আমি দেখেই চিনেছি।"

"কি দেখলেন চৌবেজী? তার জবাব হোলো—সওয়া পাঁচ হাত লম্বা জোয়ান, লাল ভাঁটার মত আঁখ, ভূঁয়র লাল মিশালো রংয়ের দাড়ী, মোছ ছাঁটা, লম্বা নাক, আর বড় বড় দাঁতসুদ্ধ মুখ। ইয়া চৌড়া ছাতির উপর সাদা মিরজাই। হাত পা টেরা বেঁকা, ছোরার মত বড় নখ। ঘাড়ে কাঁধে জাঙ্গে কাঁটা কাঁটা লোম, লাল-কালো মিশাল রংয়ের। আমি ভূত

ঝাড়ার জন্য গঙ্গাজল দিয়ে আচমন করব এমন সময় সে 'উগ, বুগ, গুব্ গুব্ বলে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই 'গাঁ আঁ আঁ' করে গর্জে এক থাপ্পড়ে আমার এই আড়াই মন মূর্তিকে বারো হাত ছিট্‌কিয়ে সিঁড়ির উপর ফেলে দিল।"

"এই বলে চৌবেজী বল্লে, 'রানীমা, এ-ওঝার কম্ম নয়। পীর ফকির ডাকিয়ে আনুন' বলে সে চলে গেল।"

সকলে একসঙ্গে বল্লে, "শাহ্ চুকন্দর!"

মণ্টু বলে উঠলো, "সে আবার কি?

দারোয়ানজী বল্‌তে লাগলো, "আরে সে ছিল ভারী নামজাদা ফকির। ঝান্সী থেকে লক্ষ্ণৌ আর ইলাহাবাদ থেকে দিহ্‌লী সব সাধু সন্ত ফকির তাকে বুজুর্‌ক্ বলে মান্‌তো।"

সবাই এ ওর মুখের দিকে রইল। গণশা বল্লে, "বাপ্‌স্। চুকন্দর—বুজরুক! কি যে বলে জমাদার।"

বড়দা বল্লে, "হাঁ, ওটা কি রকম হোলো জমাদার? চুকন্দর তো কি যেন অসুখ—"

"অরে না, না। চুকন্দর এক রকম সব্‌জি আছে, শালগম, শকরকন্দ, মিঠা আলু না? তেমনি খুব মিঠা, লাল রং, তোমরা বল বীট। ফকির সাহেব সেটা নিজে খুব খেতো, ঘোড়াকে খাওয়াতো, বকরাকে খাওয়াতো। হর্‌রোজ নাস্তায় খেতো, যখন পেতো। তাই লোকে নাম দিয়েছিল শাহ্ চুকন্দর। ওর আস্‌লি নাম ছিল ইস্‌কন্দর ইয়াহিয়া খাঁ উজ্‌বগ্।"

নাম শুনে সকলে তো হতভম্ব।

মণ্টু বল্লে, "দারুণ নাম সব বলে জমাদার। ইয়া ইয়া উজ্‌বুগ্! আবার তার উপর বুজরুক!" সকলে খুব হেসে উঠ্‌লো।

দারোয়ানজী খুব জোরে বল্ল, "হাঁ, উজ্‌বগ্ তো ছিলই সে, আর বুজর্‌ক্ ভি ছিলো। তোমরা তার কি জানো? অরে কত লোকের রোগ ভাল করলো, কত গরীবকে আমীর বানালো, কত বড়ো খানদানের সরিকানার দিক্‌দারি দূর করলো। কত পুরানো বাড়ির শয়তান ভাগালো সে, দানোর অত্যাচার ঠাণ্ডা কর্‌লো। তোমরা তো জানো শুধু হিঁ হিঁ করে হাঁসতে।"

নরেশবাবু বল্লেন, "কী যে কর তোমরা হাসাহাসি। না, না, জমাদারজী, বল তো তারপর কি হোলো?

একটু থেমে, মুখে খইনী ঢেলে দারোয়ানজী ফের আরম্ভ করলো—"সকলে তো বল্লে

শাহ্ চুকন্দর! কিন্তু শাহ্ চুকন্দর মিল্‌বে কোথায়? গধরের পর তার কোন পাত্তাই কেউ জানেনা। কেউ বলে সে দিহ্‌লির বাদশার সঙ্গে চলে গেছে কালাপানী পার, কেউ বলে সে গেছে কলকাত্তা, লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের কাছে।"

"রাজবাড়ির, মেহালের, আশা-ভরোসা ছেড়ে দিলো সবাই। ছোট নূতন বাড়ি তৈরি হোলো ইট গারা, লাকড়ি খাপ্‌রা দিয়ে ঠাকুর ঠাক্‌রাইনদের জন্যে। ওদিকে মেহালে ভূত-দানোর উপদ্রো বেড়েই চল্লো দিনরাত।"

"রাতে দূর থেকে হামলোগ শুনতাম দড়্ দড়্ ঝন্‌ঝনা, যেন কেউ মেহালের ছাদ-দিওয়ার ভেঙ্গে ফেল্‌ছে। অউর চীচকার? এক এক রাতে তো মনে হোতো, কার তো গলা চেপে ছাতি ফেড়ে, খুন চুস্‌ছে কে যেন, এরকম কাঁদছে আর গর্‌জাচ্ছে সব! সে আওয়াজ এতো ভয়ানক যে জোয়ান লোকও ভয়ে রামনাম জপ করতো। লোকে বলতো, কোন গরীব, ভিখারী কি পাগল, হয়ত ভুলে ঢুকেছিল মেহালে, তাকে শেষ করে দিলো দানোয়। আমরা ছোক্‌রা লোগ তো ভয়ে দিনের বেলায়ও যেতাম না সেদিকে,—কি মেহালে কি বাগিচায়।"

"এই রকমে বরস ঘুরে চল্লো। একদিন খবর এলো, শাহ্ চুকন্দর ফিরে এসেছেন কেউ বলে, 'শাহজীকে দেখলাম বুলন্দশহরে,' আবার কে তো বলে, 'না, অনুপশহরে কি উনাওয়ে।' লোক বাগ ছুটলো খোঁজাখোঁজিতে চারিদিকে।"

"দিনের পর দিন গেল, মাঘ ফিরে ফাগুন এলো, হোরি খেলা শেষ হয়ে, মাস পার হয়ে গেলো। গাছের পাতা ঝরে নূতন পাতায় গাছে গাছে হরিয়ালি খেললো। ক্ষেতের গমে গোছ ধরলো, বাগিচার আমের খোশবোয় হওয়া ভরপুর হোলো।"

"এমন এক দিনে, গাঁওয়ে সোর পড়ে গেলো, শাহ্‌জী আ গঁয়ে!' গাঁওসুদ্ধ লোক, ছেলেবুড়ো মরদ আওরত ছুটে এলো বড় রাস্তায়, যে রাস্তা গায়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে বরাবর উত্তর-পাচ্ছিমে দিহ্‌লী তক্। সেখানে সকলে দেখ্‌লো আস্‌ছে শাহ্‌জীর সওয়ারী।"

"সবার আগে এলেন, কালো তুর্কমানি ঘোড়ায় সওয়ার, খুদ্ হজরত শাহ্ চুকন্দর। ওয়াহ্, সে কী ঘোড়া, কী সওয়ার, বাহ্‌বা কী বাহবা! ঘাড় বেঁকিয়ে আস্তে কদম ফেলে চলেছে ঘোড়া, ঝক্‌মক্ কর্‌ছে তার কালো বার্নিসের মত গায়ের রং, ঝল্‌মল্ কর্‌ছে তার সাজ তার ঘাড়ের লেজের চামর। আর সওয়ার? তার যেমন চেহ্‌রা তেমন ঠাট্ সে কি বলবো আমি? পিছনে ছিল আরো চার পাঁচটা ভাল ঘোড়া, আর ছিল চার জন মুরীদ শাগির্দ লোক। তার মধ্যে একটা ছিল বহুৎ দুবলা আর ভারী লম্বা, বাঁশের লাঠির মত, মুখে

ছিল তার পাতলা লম্বা দাড়ি মোছ চীনাদের মত। একজন ছিল গেঁটে নাটা বেঢ়প চওড়া, তিন হাত উঁচা তো আড়াই হাত চওড়া, মর্দ জোয়ান, দাড়ি মোছ মুখ ভর্তি। বাকী দু'জন ছিল মামুলী তুর্ক, না জোয়ান না বুঢ়া, তবে মজবুত! কেউ ঘোড়া ধরে, কেউ ঘোড়া চড়ে, এলো তারা শাহ্‌জীর পিছে পিছে গাঁওয়ের ভিতর।"

"চারিদিকে হল্লা লেগে গেলো। 'শাহ্‌জী মেহেরবান্, হুজরত বন্দা নেওয়াজ, গরীব পরবশ্' ব'লে হাঁকাহাঁকি করে ঘিরে দাঁড়ালো গাঁয়ের লোক।"

"হাত তুলে হাঁক দিলেন শাহ্‌জী 'খামোশ'। তারপর 'বর্শ রুস্তম' বলে ঘোড়ার ঘাড় চাপড়ে, নেমে দাঁড়ালেন লোকের আরজী শুনতে। সে কী চেহ্‌রা!"

"চার হাতের উপর লম্বা, ইয়া চওড়া ছাতি, আঁখ জ্বল জ্বল, তিরছা নাক শিখরা চিড়িয়ার মতো, ঢিলা আস্তিন লম্বা সুত্‌রী পশমের আচ্‌কান। শিরে কুলা টোপীতে বাঁধা রঙ্গীন রেশমী পগড়ি, পায়ে কাবলী চপ্পল, কোমরে কমরবন্দে বাঁধা খঞ্জর, আওর শমসের তল্‌ওয়ার। মুখ বদনের রং যেন আনার-বেদানা, সেই সঙ্গে লম্বা সুর্খ দাড়ি আর সুর্খ মোছ। দেখে মনে হয় যেন দিহ্‌লীর বাদশাহ্‌ ফকিরী নিয়েছেন।"

"দাঁড়িয়ে শুনলেন শাহ্‌জী সব কথা। সব শুনবার পর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন রাজবাড়ির দিকে মুখ করে। অনেকখন চুপ করে দেখলেন, শুধু হাতে তাঁর তসবি ঘুরছিল। পরে ধীরে পা ফেলে চল্লেন তিনি মেহালের দিকে। তাঁর পিছনে চল্লো লাগাম ছাড়া রুস্তম ঘোড়া, সেই সঙ্গে চল্লো মুরীদ শাগির্দ সবাই ঘোড়া ধরে আর তাদের পিছে পিছে গাঁয়ের লোকজনসুদ্ধ চল্লেন ঠাকুর নারায়ণ সিং।"

"শেরওয়ালি দরওয়াজা পার করে লোকে এগোলো রাজবাড়ির খাস পথে। সড়কের উপর ঘাস গজিয়ে শুকিয়ে আছে, তার উপর শুখা পাতা, কাঁটা লাকড়ী। দুই পাশে ঝোপ ঝাড় জঙ্গল হোয়ে আছে, তার মাঝে বড়া ভারী একটা গাছ মরে বড় বড় শুখা ডাল আকাশের দিকে তুলে খাড়া হয়ে আছে।"

"রাস্তা পার করে দরবার ঘর নাটমহাল বরাবর আমরা গেলাম। কোথায় দরবার কোথায় নাটমহাল! পনের বরস্ আগের গোলাবাড়িতে যা বাকী রেখেছিল, জল ঝড় আর গাছের জড়-শিকড়ে তাও শেষ করেছে। রয়েছে শুধু চওড়া পাথর বাঁধান আঙ্গিনা, তার মাঝে ইঁদারা লাল পাথরের ছাদে ঢাকা, তার সামনে সাদা পাথরের চবুতরা আর এক পাশে একটা পুরানো নিমগাছ। আঙ্গিনার ওপারে অন্দর মেহালের ভাঙ্গা দিওয়ার আর তার ওপারে আঁধারে

ভরা অন্দর মেহালের ভাঙ্গা বাড়ি-ঘর-দালান—যে দিক দেখলে ডর লাগে। আঙ্গিনার আর এক দিকের সীমানায় শিবালয় আর পূজাবাড়ি।"

"নিমগাছটার চারিপাশে খুলা মাটির জমীন। আগে ফুলওয়ারী ছিল সেখানে এখন শুধু ঘাস। শাহ্‌জী সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলেন ইঁদারা চবুতরা আর নিমগাছ। তারপর শুধু বল্লেন, 'ইন্-জ'।"

"সঙ্গের লোকজন ঘোড়া দাঁড় করিয়ে সামান নামাতে লাগলো, তাঁবু ফেল্‌তে লাগলো। গাঁয়ের লোক আঙ্গিনা কিছুটা সাফ করল। সেখানে ছোট ছাউনি পড়লো শাহ্ চুকন্দরের। গাঁয়ের থেকে এলো সিধার আটা, দাল, ঘি, চিনি সব। গাঁয়ের মুসলমানরা দিলো মুর্গী, বকরা খাসী, আর যে যেখানে থেকে পেলো এনে দিলো দশবিশটা চুকন্দর।"

"সাঁঝের আগেই সব লোক চলে এলো। দূরের থেকে দেখা গেল শাহ্‌জীর তাঁবুর সামনে একটু দূরে বড়ো এক আগুনের কুণ্ড জ্বালা হোয়েছে, বড় বড় লাকড়ির। আর পিছনে, ঘোড়া বাঁধা যেখানে তার পাশে লঙ্গরখানার আগ জ্বল্‌ছে। লোকে দেখলো শাহ্‌জী চবুতরার উপর নমাজ প'ড়ে, খাড়া হয়ে দেখলেন আঁধেরা মেহাল সব কিছুক্ষণ, তারপর তাঁবুর ভিতর চলে গেলেন। সে রাত্রে নানারকম আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু সকালে দেখা গেলো শাহ্‌জীর দল ঠিক মত আছে।"

"আরো তুই চার দিন গেলো। দিন-তুপহরে গাঁয়ের লোক সব যেতো শাহ্‌জীর কাছে, তাঁর খেদমতে নানা জিনিস নিয়ে। তারা পুঁছতো কি হোবে ভূত ভাগাবার, কিন্তু জবাব কিছুই মিল্‌তো না। দিনের পর দিন শাহ্‌জী শুধু দাঁড়িয়ে দেখতেন কি, আঙ্গিনায় তস্‌বি হাতে টহল দিতেন। রাতে আওয়াজ চীৎকার চল্‌তো আগের মত।"

"ঐ রকম কয়দিন গেলো, হঠাৎ একদিন ভোরে সেই বেঁটে জোয়ান শাগির্দ এসে ঠাকুর-নারায়ণ সিংকে বল্লো, শাহ্‌জী চেয়েছেন সওয়া মন মোম, সওয়া মন রেড়ীর তেল, দশ সের গন্ধক, দশ সের সোরা, পাঁচসের মস্তগী, পাঁচসের লবান, সওয়া সের কর্পূর ও আরও অনেক কিছু, লোহাচুর তামাচুর আরও কি কি। ঠাকুর সাহেবের হুকুমে ঘোড়ায় চড়ে লোক ছুট্‌লো শহরের গঞ্জে সে সব আনতে। তুপহরের মধ্যে পৌঁছে গেলো সব চিজ্ শাহ্‌জীর কাছে।"

"সেইদিন সাঁঝের পর গাঁয়ের লোক দূর থেকে দেখ্‌লো শাহ্‌জী ও তাঁর কয়জন চেলা মশাল হাতে অন্দর মেহালের দিওয়ারের দিকে ধীরে ধীরে, একের পিছে আর চলেছেন। দিওয়ারের ভাঙ্গা ফাটকের কাছে শাহ্‌জী দাঁড়ালেন আর তার এক শাগির্দ হুতোড়া দিয়ে কি

একটা কিলা ঠুকে এঁটে দিলো সেই ভাঙ্গা ফাটকের গায়ে। তারপর শাহ্‌জী মশাল উঁচু করে ধরে অন্দরানের দিকে মুখ করে বাঁ হাত দিয়ে ফাটক দেখিয়ে, জোরে হাঁক দিলেন: 'নিগাহ্‌-কুনিদ, খোন খোর'।"

"সে হাঁকের আওয়াজ, মেঘের ডাকের মতো, অন্দর মেহালের গায়ে টাল খেয়ে গড়্‌গড়্‌ করে শোনাতে লাগলো।"

"শাহ্‌জী ফিরে এলেন আর তাঁবুর চার পাশে মশালদানে চারটা মশাল লাগানো হোলো, সে যেন বিজলী বাতির মত জলতে লাগলো। লোকজন কিছুক্ষণ দেখে চলে গেলো যে যার ঘরে।"

"সেই রাত থেকে মেহালের ভয়ানক আওয়াজ কি রকম বেশী হতে লাগলো তা কি বলবো। লোকে তো ভাবলে হাজার দানো মিলে শাহ্‌জীকে ছিঁড়ে খেতে গিয়েছে। ভোর হতেই সবাই ছুটে গিয়ে দূর থেকে দেখলো শাহ্‌জীর ছাউনি ঠিক রয়েছে। তাঁর লোকজন ঘুরে ফিরে সাফাই ধোলাই করছে, ঘোড়াকে চারা দিচ্ছে।"

"দুপহরে লোকে গিয়ে নানা কথা পুঁছলো, জবাব মিললো না। কিন্তু সাহসী দু'চার ছোকরা গিয়ে দেখে এলো সেই দিওয়ারের ভাঙ্গা ফাটকে একটা তক্তি কিলা দিয়ে আঁটা; তক্তির উপর আরবীতে কি লেখা রয়েছে।"

"এই রকমে রোজ মশাল জেলে তক্তি আঁটা চল্ল অন্দর মেহাল ঘিরে। লোকে বল্লে শাহ্‌জী ঘেরা এঁটে শয়তানদের বন্দী করছেন। অল্পে অল্পে ঘেরা এগোলো।"

"চৈত মাসের শেষের দিকে একদিন সাঁঝের বেলায় ভয়ানক আঁধি-ঝড় এলো। ঝড়ে গাছ ভেঙ্গে পাতা খড় উড়ে ভীষণ আওয়াজ, তার উপর ধূলায় অন্ধকার। লোকজন ঘরদোর বন্ধ করে রইল। মাঝ-রাতের কাছাকাছি হাওয়ার জোর কমে গেলো। সকলে শুতে গেলো।"

"তার এক পহর পরে গাঁয়ের চৌকিদার 'আগ লগা হয়' বলে চেঁচিয়ে গাঁশুদ্ধ জাগিয়ে দিলো। লোকে বেরিয়ে এসে দেখলে রাজবাড়ির মেহাল বাগ বাগিচা সব আগুনে ছেয়ে গেছে। অন্দরান জলছে যেন জালামুখী পাহাড়, তার আগুনের হলকা তার ধুঁয়া উঠে আসমান লাল। চারিধারে শুকনা গাছ ঝোপ-ঝাড়ও জলছে, যেন আগুনের তালাওয়ের মাঝে আগুনের পাহাড়। শুধু মাঝের আঙ্গিনা জেগে আছে, তাও আগুনের রোসনিতে দিন-দুপহরের মত উজালা লাল হোয়ে। আর সেই আঙ্গিনার মাঝে দেখা গেলো শাহ্‌জীর লোকজন তাঁবু গুটিয়ে, ঘোড়া ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছে। ঘোড়া সব ভিড়্‌কে ক্ষেপে গেছে। এক তো আগুন, আর গাছপালা

পুড়ে ফেটে ভেঙে কড়া কড়-ড়্ তোপদাগার মত আওয়াজ দিচ্ছে, তার উপর মেহাজের ভিতর থেকে যেন হাজার দানো গরজাচ্ছে, হাসছে, ইট-পাথ্থর ফেলছে।”

“তারি মধ্যে দেখা গেলো ছায়ার মত কি সব যেন সেই আঙ্গিনার দিওয়ারের পাশে পাশে ঘুরছে। আঙ্গিনা থেকে বেরোবার পথ ছিল শুধু শেরওয়ালি দরওয়াজার পথের দিক। সেদিকে আগুন কম, শুধু দরওয়াজার কাছের সেই ভারী বড় শুখা গাছটা প'ড়ে গিয়ে আগ লেগে গেছে। কিন্তু যেদিকে আগুন কম সেইদিকে ঐ ছায়ার মত কি সব যেন ভীড় করে আছে। শাহজীর বেরোবার পথে সেও এক আফদ্। গাঁয়ের লোক তো তখন আগুন থেকে গাঁ বাঁচাবার চেষ্টায় ব্যস্ত, শুধু আমরা ছেলে ছোকরারা আর দুই চারজন বুড়া দাঁড়িয়ে দেখছি শাহ্জীর বিপদ।”

“একটু পরে আমরা দেখ্লাম শাহ্জী রুস্তম ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন, অন্যেরাও ঘোড়ায় উঠেছে আর লাহুয়া ঘোড়ার রাশ ধরে টানছে। শাহ্জী ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন বেরোবার পথ দেখছেন।”

“শাহ্জী ঘোড়া সামলে এগোলেন যেদিকে আগুন কম, তাঁর পিছনে অন্যদের সব ঘোড়াও লাফ-ঝাঁপ করতে করতে এগোতে লাগলো। হঠাৎ সবাই দেখলো সেই দিকেই ছায়া-ধুঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো কি ভয়ানক কয়টা কিছু—না আদমী, না জানোওয়ার কিছুটা ভালুর মত কিছুটা মানুষের মত। দূর থেকে আগুনের আলো-ছায়ায় মনে হলো যেন পাঁচ-সাত হাত উঁচু এক একটা। সেগুলো যেন পথ রুখে দাঁড়ালো, আর শাহজীর দলও আটকে গেলো, শুধু ঘোড়াগুলো পাগলের মত লাফাতে লাগলো।...”

“শাহ্জী সোজা হয়ে ঘোড়ার উপরে যেন এক মুহূর্ত বসলেন। তারপর অচানক 'শন্' করে ডান হাতে নিলেন খুলে শম্সের তলওয়ার। সেই ক্ষণেই তলওয়ার। ঝল্মল্ করে উঠলো উপরে। শাহ্জী রেকাবের উপর দাঁড়িয়ে ছাড়লেন হাঁক।”—

“অল্ হম্দ্ উল্ ইল্লাহ্।”

“সে শোনালো যেন জঙ্গের-ময়দানের হল্লার মধ্যে ভেরীর আওয়াজ। রুস্তম ঘোড়া লাফিয়ে তীরের মত ছুট্‌ল সেই ছায়া মুরতগুলোর দিকে, তার পিছনে ছুট্‌ল অন্য সব ঘোড়া আর সওয়ার। আঁখের এক পলকের মধ্যে সব যেন মিলিয়ে গেল—ধোঁয়া ছায়া আর আগুনের মধ্যে। সবাই দম বন্ধ করে দেখ্তে লাগলো কি হয়।”

“কি হোলো, কি হবে ভাবতে ভাবতে সবাই দেখলে শেরওয়ালি দরওয়াজার ওপারে সেই শুখা গাছের আগুনের বেড়া ফেঁড়ে, জলন্ত গুঁড়ি লাফিয়ে বেরুলো শাহ্জীকে নিয়ে রুস্তম

'আগুনের বেড়া ফুঁড়ে, জ্বলন্ত গুঁড়ি লাফিয়ে বেরলো শাহ্‌জীকে নিয়ে রুস্তম ঘোড়া।

ঘোড়া। তার বুকেও পায়ে লেগে আগুন ছট্‌কে পড়ল যেন ঝোরার জল, আর তার পিছনে একেএকে লাফিয়ে এলো অন্য সব ঘোড়া, সওয়ার ”

“ঝড়ের মত দরওয়াজা পার হোলো রুস্তম। আমরা দেখ্‌লাম এক মুহূর্তে শাহ্‌জীর তলওয়ারে খুন, রুস্তম ঘোড়ার জিনের নামদায় খুন। দেখতে দেখতে ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে গেল শাহ্‌জীর সওয়ারী বড় রাস্তার দিকে, আর ঝড়ের হাওয়ারই মতো দিহ্‌লীর দিকে ছুটে মিলিয়ে গেল রাতের আঁধেরায়, আগুনের ধোঁয়ায়। না ফিরে তাকাল, না কিছু বল্লো।”

“তিন দিন তিন রাত আগুন আর ঝড় চল্লো। গাঁয়ের লোক জানের আশা ছেড়ে গাঁ বাঁচাতে লড়্‌লো সেই আগুনের দরিয়ার মুখে। চৌথা রাত্রে দেবতার দয়া হোলো, হাওয়া থেমে গেলো, কিছু জলও বর্ষালো শান্তিতে ঘুমালো গাঁয়ের লোক।”

“বিহানে ভোরে উঠে সকলের মুখে এক কথা। রাতে আওয়াজ তো কেউ কিছু শুনে নাই। ছুট্‌ল সকলে রাজবাড়ির দিকে। সেখানে গিয়ে দেখে যাদুঘরের খেলার মতো তাজ্জব ব্যাপার!”

“বাগিচার ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল প্রায় সব জ্ব'লে খাক হয়ে ঝড়ে উড়ে গেছে। রাজবাড়ির মেহালের ছদ্‌-ছপ্পড়, খম্ভা-দিওয়াল পুড়ে, পড়ে, ভেঙ্গে, চৌপট। শুধু জেগে আছে শিবমন্দিরের চূড়া আর ইঁদারার উঁচু লাল পাথরের ছাদ। এখানে সেখানে পুরানো গাছ দুটো-চারটে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর ডাল-পালা উচা ছিলো বলেই বেঁচে গেছে। সারা এলাকায় না চিড়িয়া, না জানোয়ার, কোনও কিছুর শব্দ নাই। সব একদম সাফ্, একদম চুপ।”

দারোয়ানজী থেমে গেল। সবাই চুপ। খানিক পরে গণেশ মিহি গলায় জিগ্যেস করলে—“তারপর?”

জমাদার গোঁফ দাড়ি ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে তারদিকে তাকিয়ে বল্লে—“ব্যস্” —
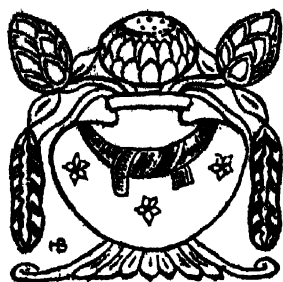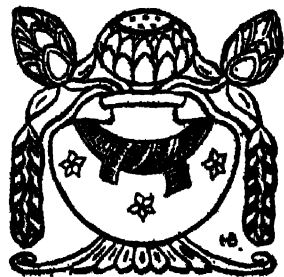
অনেক কাল আগে বৈশালী শহরে রত্নধর নামে এক সওদাগর ছিল। রত্নধর পৈতৃক অনেক টাকাকড়ি সম্পত্তি আর প্রকাণ্ড ব্যবসা হাতে পেয়েছিল। অন্য কেউ হলে, কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্য কিছু না করেও ঐ সব দিয়ে সাতপুরুষ রাজার হালে কাটাতে পারতো। কিন্তু রত্নধর লোক ছিল অতি সোজা আর তার মনটা ছিল ভারী কোমল। কারুর দুঃখ কষ্ট দেখলে সে আর থাকতে পারত না। এ রকম হলে যা হয়, রত্নধরের ভাগ্যেও তাই ঘটলো। রাজ্যের দুঃখী দরিদ্র আর ঠগ জোচ্চোর তার বাড়িতে সর্বদাই ভিড় লাগিয়ে থাকতো। তার মধ্যে লুব্ধক নামে রত্নধরের এক দূর সম্পর্কের ভাই ছিল সবচেয়ে বড় উমেদার। চেয়ে চিন্তে, ছল কোরে, নানা উপায়ে সে প্রায় রোজই তার কাছ থেকে বেশ কিছু আদায় করে তবে ছাড়তো। আবার লুব্ধক লোকটা ছিল এমন খারাপ, যে রত্নধরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, সে তার হিংসেয় জ্বলে মরতো আর সর্বদাই কি করে তার অবস্থা খারাপ করা যায় সেই চেষ্টায় থাকতো।

কিছুদিন পরে লুব্ধকের মনের মত অনেকগুলি জোচ্চোর বন্ধু জুটলো। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে ফন্দি আঁটলে, রত্নধরের যথাসর্বস্ব লুঠ করতে হবে।

রত্নধরের নিয়ম ছিল, রোজ সকালে পূজা সাঙ্গ করে বেরিয়ে সামনে যে কজন ব্রাহ্মণ দেখতে পাবে তাদের সকলকে যে যা চাইবে তাই দেওয়া।

এ নিয়ম পালন করতে গিয়ে তাকে কখনো তেমন বিপদে পড়তে হয়-নি, কেননা সেকালের ব্রাহ্মণরা ছিলেন ভাল। বিশেষ দরকার না হলে তাঁরা কারুর কাছে কিছু চাইতেন না, আর চাইলেও যা নেহাত দরকার তার বেশী নিতেন না।

লুব্ধক ঠিক করলে যে, সে রোজ সকালে রত্নধরের পূজার মন্দিরের দুয়ার আটকিয়ে

আসল ব্রাহ্মণদের ঢুকতে দেবে না, আর তার সেই জোচ্চোর বন্ধুর দল রোজ বহুরূপীর মত চেহারা ফিরিয়ে ব্রাহ্মণ সেজে রত্নধরের কাছ থেকে দান নেবে।

এই রকম কৌশলে লুঠ আরম্ভ হোলো। নকল ব্রাহ্মণের দল রোজ অসম্ভব রকমের ভিক্ষা চাইতে শুরু করলে। রত্নধর প্রাণপণে তাই দিতে থাকলো, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখী আতুরদের দান করাও চল্লো। রত্নধরের শুভার্থীরা তাকে অনেক বোঝালেন যে, এসব লুব্ধকের কারসাজী কিন্তু সে সেসব কথা বিশ্বাস করলে না। ফলে অল্প কিছু দিনেই তার অবস্থা খারাপ হয়ে এল, আর লুব্ধকের দল টাকাকড়ি মনি মুক্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এই রকম অবস্থা যখন, রত্নধরের প্রকাণ্ড সংসার প্রায় অচল, বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির, তখন এক রাত্রে রত্নধর স্বপ্নে দেখলে যে, এক অতি সুন্দর সৌম্যমূর্তি এক পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রত্নধর আশ্চর্য হয়ে তাকে জিগ্যেস করলে—প্রভু আপনি কে ?

দিব্য পুরুষ উত্তর দিলেন :—বৎস্য আমি তোমার ইষ্টদেবতা। তোমার সত্য রক্ষার চেষ্টায় এবং দানধ্যানে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।

রত্নধর বল্লে—প্রভু যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আশীর্বাদ করুন, এ অধম যেন দানধ্যান ও সত্য রক্ষা করে এ জীবন কাটাতে পারে।

দেবতা বল্লেন—তথাস্তু ! বৎস তুমি তোমাদের দিঘির পাড়ে যে পুরানো মন্দির আছে তার ঈশান কোণে একটা বন্ধ গর্ত দেখবে। সেই গর্তে এক সুড়ঙ্গের মুখ। তার ভিতরে গুপ্তধন আছে, তুমি নির্জনে সেখানে প্রবেশ করে তাই নেবে, তাতে তোমার অবস্থা আগের মত হবে।

এই বলে দেবতা অন্তর্ধান হলেন। রত্নধর সেই রাত্রেই ঘুম থেকে উঠে সেই ভাঙা মন্দিরে গেল। সেখানে দেবতার নির্দেশ মত সুড়ঙ্গের মুখ পরিষ্কার করে মশাল জ্বেলে তার ভিতরে নামলে। কিছুদূর নেমে সে দেখতে পেলে সুড়ঙ্গ একটা প্রকাণ্ড ঘরে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর হীরা মণি মুক্তায় ভরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলসী সাজান। সে যতটা পারে সেই সব মণি মুক্তা নিয়ে বেরিয়ে এসে গর্তের মুখ বুজিয়ে বাড়িতে ফিরে এল।

রত্নধরের অবস্থা আবার ফিরলো। আগেকার মত দানধ্যানও চল্লো।

এদিকে লুব্ধকের দল, রত্নধর সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে ভেবে তার কাছে আর আসতো না। তারা মনের আনন্দে ঠকিয়ে নেওয়া টাকায় ফুর্তি করে রাজার হালে থাকতো আর যখন তখন সব জায়গায় রত্নধরের নিন্দে করে ঠাট্টা করে বেড়াত।

এমন সময় তাদের কাছে খবর এল যে, রত্নধরের বাড়ি আবার ধনরত্নে, হাতি ঘোড়ায় ভরে উঠেছে বরং আগেকার চেয়ে বেশী।

লুব্ধক বিশ্বাস করতে না পেরে তাড়াতাড়ি সেখানে গেল। রত্নধর তাকে আদর করে অভ্যর্থনা করলে। লুব্ধক সেখানে ঘুরে ফিরে যা দেখলে তাতে তার সর্বাঙ্গ রাগে হিংসায় জ্বলে যেতে লাগলো।

ফিরে এসে সে তার সেই জোচ্চোর বন্ধুর দলকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। কিছুক্ষণ পরে একজন বল্লে—দেখো, রত্নধর কোথাও বিদেশে ব্যবসা করতে যায় নি যে সেখান থেকে এত ধনরত্ন পাবে। ওর এখানকার সম্পত্তি যা সে সব ত আমরা পাঁচজনে লুঠ করে ভাগ বাঁটোয়ারা করেছি। কাজেই ও নিশ্চয় কোথাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে এনে ও এই রকমে নিজের অবস্থা ফিরিয়েছে। লুব্ধক বল্লে—ঠিক বলেছ। এর সন্ধান নিতে হচ্ছে। ও নিশ্চয়ই সমস্ত সরাতে পারেনি, কেননা ও একলা লুকিয়ে আর কতটা এক সঙ্গে আনতে পেরেছে? যদি প্রকাশ্যে বা লোকজন নিয়ে এ কাজ করতো তাহলে তার কানাঘুষো আমরা নিশ্চয়ই শুনতুম।

সেদিন রাত্রে লুব্ধক রত্নধরের বাড়ির কাছে লুকিয়ে রইলো। মাঝ-রাত্রে রত্নধর একলা মন্দিরের দিকে চল্লো। তার পেছনে লুব্ধকও চল্লো।

দু-চার দিন পরে এক অমাবস্যায়, লুব্ধকের দলবল ত্রিশ চল্লিশটা ঘোড়া নিয়ে সেখানে গিয়ে, রত্নধর চলে যাবামাত্র সেখানে ঢুকে সারারাত ধরে, যত ধনরত্ন ছিল সব তুলে নিয়ে চলে এল।

বেচারা রত্নধর পরের রাত্রে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথায় বাজ পড়লো। কিন্তু কি আর করে, মনের দুঃখ মনেই রেখে সে বাড়ি ফিরে এল।

কিছুদিন গেল, আবার তার সংসারে টানা-টানি পড়লো। দীন দরিদ্ররা ভিক্ষা পায় কি পায় না এমন অবস্থা।

ফের একরাত্রে রত্নধর স্বপ্নে তার ইষ্টদেবতার দেখা পেলো। সে ভক্তিভাবে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি হাসিমুখে তাকে বল্লেন—বৎস তুমি অতি সৎ সাধু লোক। কিন্তু তোমার মন এত সরল যে তোমার দ্বারা ধনরক্ষা সহজে সম্ভব হবে না। যাহা হউক আমি তোমাকে রক্ষা করার উপায় করছি। কাল তোমার পূজার সময় এক ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর আসবে। সে আসবামাত্র তুমি দরজা বন্ধ করে তাহার মাথায় জলের পাত্র দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করবে।

ব্রাহ্মণ মরে পড়ে গেলে তুমি পূজার ফুল তার ওপর নিক্ষেপ করবে। তা হলে ব্রাহ্মণের শবদেহ মণি মুক্তার স্তূপে পরিণত হবে। তুমি তার কিছু অংশ ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণদের দিয়ে বিদায় করো এবং যা বাকী থাকবে তাই দিয়ে সংসার চালিয়ো।

ব্রাহ্মণকে মারতে হবে শুনে রত্নধর আঁতকে উঠে বল্লে—প্রভু এ যে মহাপাতক, এ কি করে করবো ?

ফের এক রাত্রে রত্নধর স্বপ্নে তার ইষ্টদেবতার দেখা পেলো।

দেবতা হেসে বল্লেন—যে যাবে সে ব্রাহ্মণ ত নয়ই, সে জীবই নয়। আমার মায়া মাত্র। তুমি নির্ভয়ে আমার আদেশ পালন করো।

দেবতা এই বলে অন্তর্ধান হলেন।

পরদিন রত্নধর পূজায় বসেছে। খানিক পরে সত্যি-সত্যিই পূজার ঘরের দরজা ঠেলে এক ব্রাহ্মণ ভিতরে এসে উপস্থিত। রত্নধর দরজা বন্ধ করে, ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণের মাথায় পূজার

জলধরা ঘটি দিয়ে এক ঘা দিতেই ব্রাহ্মণ পড়ে মরে গেল। তারপর তার গায়ে পুজোর ফুল ছড়িয়ে দিতেই ব্রাহ্মণের দেহটি একরাশ মণিমুক্তো হয়ে গেল। পুজোর পর, তার কিছু দান করে বাকীটা সে ঘর সংসারের জন্যে নিয়ে গেল।

এদিকে লুব্ধকের দল ত কিছুতেই ঠাওর করতে পারে না কি কোরে রত্নধর অত দান করেও সমানে চালায়। প্রথমে তারা ভাবলে বুঝি সে আবার গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু অনেক রাত জেগে অনেক ঘুরে ফিরে তারা দেখলে যে তা নয়।

শেষে লুব্ধক দেখলে যে রত্নধর পুজোর ঘরে সামগ্রী ছাড়া কিছু নিয়ে যায় না অথচ পুজোর পরেই মুঠো মুঠো মণি মুক্তো দান করে। তাতে তার সন্দেহ হওয়ায় সে রাত থাকতে পুজোর ঘরের ছাদে উঠে লুকিয়ে রইলো। ভোরের বেলায় ছাদের এক ফুটো দিয়ে সে সমস্ত ব্যাপারটা দেখলে। পুজো শেষ হয়ে গেলে সে আস্তে আস্তে নেমে এসে বাড়ি চলে গেল। সেখানে তার বন্ধুরা সব কথা শুনে অবাক। তারা অনেক পরামর্শ করে ঠিক করলে যে, রত্নধর যে বিগ্রহের পুজো করে এ ব্যাপার নিশ্চয়ই তাঁর অলৌকিক গুণে।

তারপর এক রাত্রে তারা কজনে মিলে সেই বিগ্রহ চুরি করে আনলে। ভোরে উঠেই লুব্ধক স্নান করে পুজোয় বসলো আর তার বন্ধুরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণদের ডাকলে পুজোর পরে দান নিতে।

অনেকগুলি ব্রাহ্মণ জড় হোতে, লুব্ধকের বন্ধুরা একজন বেশ মোটা-সোটা ব্রাহ্মণকে বেছে নিলে। কেননা তারা ভাবলে ব্রাহ্মণের শরীরটা যত বড় মণি মুক্তোর স্তুপটাও ততই বড় হবে। তারপরে ব্রাহ্মণকে পুজোর ঘরের ভিতরে যেতে বল্লে। ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে যেমন ঘরে ঢুকেছে আর লুব্ধক পুজোর ঘরের দরজা এঁটে তার মাথায় কলসীর এক বাড়ি লাগিয়েছে। ব্রাহ্মণ ত মার খেয়ে "ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে" বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সে যত চেঁচায় লুব্ধক তত মারে। চেঁচামেচি শুনে অন্য ব্রাহ্মণেরা বিষম গোলমাল লাগালে। সে গোলমালে পাড়াপড়শী সবাই জড় হোলো। তারপর সবাই মিলে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে দেখে ব্রাহ্মণের মাথা ফেটে রক্তারক্তি আর লুব্ধকের গায়ে রক্ত। তার হাতের কলসীও রক্তে মাখা।

তখন সকলে মিলে সেই আধমরা ব্রাহ্মণ আর লুব্ধকের দলবলকে রাজার সভায় বিচারের জন্যে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে লুব্ধক রত্নধরের পুজোর ব্যাপারে যা দেখেছিল তাই বল্লে আর স্বীকার করলে যে, লোভে পড়ে সে আর তার বন্ধুরা মিলে বিগ্রহ চুরি করে এই রকম কাণ্ড করেছে।

রাজা এসব বিশ্বাস না করে রত্নধরকে ডাকতে পাঠালেন। সে বেচারা ত সকালে পুজো করতে গিয়ে বিগ্রহ নেই দেখে, মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। খবর পেয়ে সে ছুটতে ছুটতে এসে রাজসভায় উপস্থিত হোলো। সেখানে রাজার কাছে তার স্বপ্ন, আদেশ ইত্যাদি সমস্তই বল্লে।

তারপর শহরের সবাই বল্লে রত্নধর কি রকম সৎ ও সরল প্রকৃতির লোক আর লুব্ধকের দল কি রকম জোচ্চোরি করে তার সর্বস্ব ঠকিয়ে নিয়েছে।

রাজার বিচারে রত্নধর তার বিগ্রহ আর তাকে ঠকিয়ে লুব্ধকের দল যা কিছু নিয়েছিল সব ফেরত পেল। আর লুব্ধকের দল এমন সাজা পেলে যে কি আর বলবো।
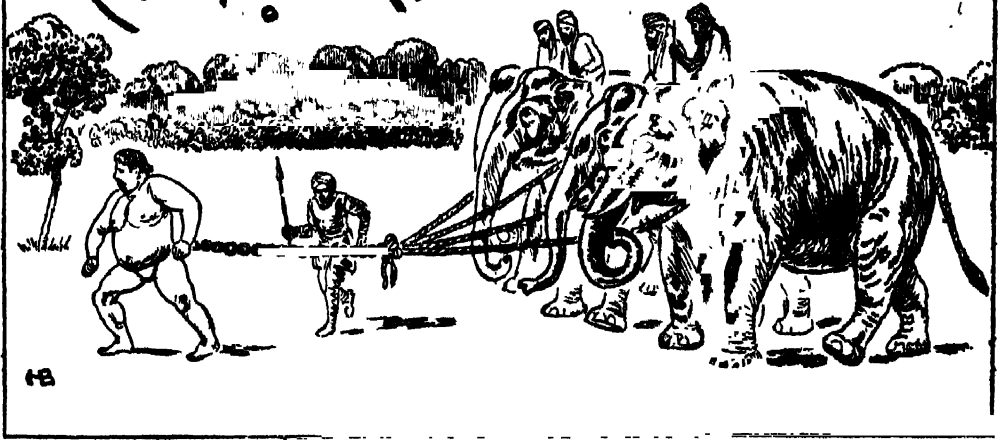
আমাদের মণ্টু মাস্টার সেদিন বক্সিং দেখতে গিয়েছিল। পরদিন রবিবার, স্কুল ছুটি, তার উপর বাড়ির বড়রাও কেউ ছিল না। কাজেই মণ্টুবাবু তার দুই ভাই, আর বন্ধু কালু, এই কজন মিলে দুপুর বেলায় বাইরের বারান্দায় বেশ জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলে।

মণ্টু খুব হাত পা নেড়ে বক্সিং-এর বর্ণনা করছিলো। লালু আর গণেশ দুজনেই তার ছোট, কাজেই তারা দাদার সব কথা হাঁ করে গিল্‌ছিল, যদিই বা সে কিছু নেহাত অবিশ্বাস করার মত বলে, ত তাতেও তাদের কিছু বলবার উপায় নেই। শুধু এক কালু মাঝে মাঝে "যা-যাঃ, বাজে বকিস নি"। ইত্যাদি বলে নিজের মান বজায় রাখছিলো।

মণ্টু বল্লে—"যাই বলিস, বক্সিং জিনিসটা একটা সায়েন্সের মত সায়েন্স; ঠিক ওজন মাফিক এক ঘুষি চোয়ালের নিচে বসালে খুব বড় জোয়ানকেও চিতপটাং—যাকে বলে নক্ আউট্ করে ফেলা যায়।"

লালু ভয়ে ভয়ে বল্লো "দাদা, বক্সিং করতে কি খুব গায়ের জোর দরকার?"

"না, তেমন কিছু নেই। ওটা কি জানিস, ঠিক কুস্তির প্যাঁচের মত, জোরের চেয়ে কায়দার দরকার বেশী।"

গণেশ বল্লে—"আচ্ছা দাদা, যদি একটা কুস্তিগির পালোয়ান আর একটা বক্সি-এর ওস্তাদে লড়াই হয় তো কে জেতে?"

হাতী রমজান

মণ্টু কুস্তিগিরের নামে নাক সিঁটকিয়ে বল্লে, "দূর গাধা! কুস্তিগিরের আবার লড়াই, তারও আবার কথা! ঐ যে কাল ব্যাট্‌লিং প্যাট বক্সিং করলে। সে ইচ্ছে করলে এক মিনিটে তোর কালু কিঙ্কর গামা সব কটাকে ঘায়েল করে দিতে পারে।"

কালু ছেলে বেলায় কিঙ্কর সিংকে দেখেছিল, তার কাছে এ কথাটা নেহাত বাজে ঠেকাতে সে তক্ষুণি বলে উঠল—"ভাগ ভাগ, রেখে দে তোর ব্যাট্‌লিং প্যাট। কিঙ্কর এক রদ্দায় তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে গঙ্গাপার করে দিতে পারতো।"

মণ্টু মহা ক্ষেপে বল্লে—"মেলা বকিস নি, যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন? ঢের ঢের কুস্তিগির দেখেছি, যত ভুঁদো মোটা মেড়ার দল! বক্সিং লড়নেওয়ালার সামনে দাঁড়ায় এমন কুস্তিগির জন্মায় নি। বিলেতে কে কুস্তি দেখে রে? আর এক একটা বক্সিং লড়িয়ে প্রতি ম্যাচে দশ বিশ হাজার পাউণ্ড পায়।"

বাড়ির দারোয়ানদের বুড়ো জমাদার, রামগিদ্ধড় সিং (সে মণ্টুর ঠাকুর দাদার আমলের লোক) এতক্ষণ কাছে বসে ঝিমাচ্ছিল। কুস্তি, বক্সিং লড়াই এই সব শুনে সে হঠাৎ কান খাড়া করে উঠে বল্লে—"এ মণ্টুদাদা, বোক সিং কোন্ দেশের পালোয়ান আছে?" বুড়ো ত ইংরেজী জানে না, কাজেই সে ভেবেছে বক্সিং বুঝি বা বোক সিং গোছের একটা নাম।

দারোয়ানজীর কথা শুনে মণ্টুর দল ত প্রথমে অবাক হয়ে হাঁ করে খানিক তাকাল, তারপর ব্যাপারটা বুঝে চারজনে খুব হাসল। একটু সামলে নিয়ে মণ্টু বুড়োকে বক্সিংটা কি জিনিস তা বুঝিয়ে দিলে।

সব শোনবার পর দারোয়ানজী বল্লো—"ও, বোক্সিং গোরাদের ঘুসা লড়াকে বোলে। হামি তো ভাবলো যে সেটা না জানি কি জবরদস্ত পালোয়ান হোবে। গামাকে মারে; কিঙ্করকে পিটে দেয়—হেঃ, হেঃ, হেঃ"—দারোয়ানজী খুব এক চোট হেসে নিলে।

বুড়োর হাসিতে মণ্টু চটে বল্লে—"এতে হাসবার কি আছে? একটা ঘুষি লড়াইয়ে গোরা অমন দশ পনরটা কুস্তিগির পালোয়ানকে মেরে ফ্লাট করে দিতে পারে। তুমি তার জান কি?"

দারোয়ানজী গম্ভীরভাবে বল্ল—"হামি আর কি জানে! হামি তো আজ পচাশ বর্স কলকাতায় রয়েছি আর তার আগে পন্দ্রা বর্স পল্টন মে কাম করেছি; হামি তো অনেক দেখলো অনেক শুনলো।" এই বলে খানিক চুপ করে, বুড়ো হঠাৎ মণ্টুর দিকে ফিরে বল্ল, "একদিকে কিঙ্কর সিং অন্য দিকে—বন্দুক সঙ্গীন বাদে—এক পল্টন গোরা দাঁড় করিয়ে দাও। কিঙ্কর এক এক রদ্দায় দশ বিশটাকে জখম করে, পল্টনকে পল্টন দু ঘণ্টায় সাফ করে দেবে। আরে

কিঙ্কর ত মরে গেলো, গোলাম, আলিয়া, ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে, সব ত মরে গেলো, এখন বোঙ্কিং এল লড়াই করতে, হাঃ!"

মণ্টু বেশ তিলকে তাল করে বাড়িয়ে বলতে পারত। কিন্তু দারোয়ানজীর একা কিঙ্কর এক পল্টন গোরা সাফ করার বহর দেখে সে বেজায় দমে গেল। তাই দেখে গণেশ মহা খুশী হয়ে দারোয়ানজীকে জিগ্যেস করলে—"জমাদার ভেট্‌কুয়ার কে ছিল?"

"আরে ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ের নাম শুনোনি আড্‌ঢাই (আড়াই) প্যাঁচ ভেট্‌কুয়ার—তার দু প্যাঁচ ছিল হাত পা সব লাগিয়ে, আর আধা প্যাঁচ ছিল হাত লাগান বাদে। এই আড্‌ঢাই প্যাঁচে সে দুনিয়া ফতে করেছিল। শুনবে তার কথা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনবো" সবাই বলে উঠলো। দারোয়ানজী তখন গোঁফে তা দিয়ে সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলো।

বলম্‌বটেরের লওয়াব (নবাব) ছিল একটা ভারী বড়ো লওয়াব। তার ছিল বড়ো বড়ো হাথি, হাজার ঘোড়া, সিপাহি, পল্টন, তোপা তমঞ্চা, আরও কত কি। আর ছিল তার এক পালোয়ান, হাথি রমজান। সেটা দেখতে ছিল একটা হাথির মতো আর তার গায়ে জোর ছিল দুটো হাথির সমান। তার সঙ্গে কুস্তিতে কেউ পেরে উঠতো না। জয়পুর, ঢোলপুর মুলতান লাহোর, সব দেশের পালোয়ান তার কাছে লড়তে এসেছিল। রমজান লড়তে নেমে এদিকে লাফিয়ে, ওদিকে কুঁদে দুই হুমকি মেরে, তিন পাঁয়তারা কষে ঠিক বাঘের মতো গর্জিয়ে, অন্য পালোয়ানটার ঘাড়ে পড়ত আর দুই হাথির শুঁড়ের মতো লম্বা হাতে জড়িয়ে তাকে কাবু করে এক আছাড়ে চিত করে ফেলতো। আছাড়ের চোটে কত পালোয়ানের হাথগোড় ভেঙ্গে চুরে যেতো।

শেষে ভয়ে কেউ তার সঙ্গে লড়তে চাইত না। না লড়তে পেয়ে রমজান ঠিক বুনো বাঘের মতো হয়ে গেলো। সে আজ এর বাড়ির দেয়াল ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কাল কারুর গাড়ি ঘোড়া উল্টে দেয়। এই মত করে শহরে বড়া অত্যাচার লাগিয়ে দিলো। শেষে যখন শহরের লোক সব মিলে লওয়াবের কাছে লালিশ (নালিশ) করলো তো, তখন লওয়াব হুকুম দিলে রমজানকে মোটা মোটা শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখতে। সকাল বিকাল সেই শিকলি ধরে চারটে হাথি, হাথি রমজানকে টহ্‌লাতে নিয়ে যেতো।

অনেকদিন গেলো সত্তুপুরের রাজার গদ্দি হোলো। সে খুব ধুম, কত তামাসা, নাচ গান, খেল ঠেট্টর কত কিচ্ছু হোলো। কত দেশের রাজা উজির লওয়াব ওমরাহ্‌ এল সে সব

দেখতে। আর সেই সময় এল সেই বলম্বটেরের লওয়াব। লওয়াব ত যা দেখে তাতেই বলে "বেশ, বেশ, তবে হামার রাজত্বে এসব অনেক রকম আছে।" কি রকম আছে জিগ্যেস করলে সে কিছু বোলে না শুধু হাসে। সব শেষের দিন হোলো দঙ্গল।

—লালু বল্লে "দঙ্গল আবার কি !"

দারোয়ানজী বল্লে "দঙ্গল মানে কুস্তির ভারী লড়াই, অনেক লোক লড়ে, যে জিতে যায় সে এক ঘড়া টাকা আর শাল দোশালা অনেক কিছু পায়।"

—মণ্টু বল্লে "ও বুঝেছি। টুরনামেণ্ট।"

দারোয়ানজী বল্লে—"তা হোবে।"—বলে বলতে লাগলো—"রাজার বড় পালোয়ান ভুট্টা সিং আর তার দুই সাগির্দ (চেলা) ত অনেক খেল অনেক কুস্তি দেখালো। রাজা খুশী হয়ে তাদের বকশিশ করে, লওয়াবকে বল্লে "লওয়াব সাহাব, কুস্তি কেমন হোলো ?" লওয়াব বল্লে "বেশ, বেশ তবে হামার দেশে এসব অন্যো রকম হয়।"

রাজা অবাক হয়ে বল্লো "সে কি হুজুর, কুস্তির আবার অন্যো রকম কি হোবে ?" লওয়াব ত কিছু বল্লো না, শুধু হাসলো।

রাজা চটে বল্লে "লওয়াব সাহেবের দেশে সবই নতুন, সেখানের কুস্তিও আজব গোছের কিছু হোবে।"

লওয়াব বল্লে—"বিশ্বাস না হয় আপনার পালোয়ানদের পাঠিয়ে দেবেন, তাদের নতুন রকম কুস্তি শিখলিয়ে (শিখিয়ে) দেবো।"

রাজা বল্লে "হাঁ ? তবে আলবাত আমার পালোয়ান সব সেখানে যাবে। আপনি তাদের শিখলাবার বন্দোবস্ত করুন।"

লওয়াব বল্লে "বেশ বেশ। তাই হোবে।" বলে একটু হাসলো।

তারপর কিছুদিন গেলো রাজার হুকমে পালোয়ানরা দিন দশ দশ হাজার ডন, বৈঠক, দৌড়, কুস্তি চালাতে লাগলো। শেষে যখন তারা বল্লে "হুজুর অন দাতা সব তৈয়ার।" তখন রাজা তাদের লোক লস্কর সমেত পাঠিয়ে দিলে বলম্বটের শহরে। সেখানে লওয়াব ত তাদের খুব খাতির করে থাকার, খাওয়ার, দেখার, সব বন্দোবস্ত করে দিলে। দু চার পাঁচ দিন যাবার পর রাজার বড় পালোয়ান ভুট্টা সিং একদিন মস্ত পাগড়ি বেঁধে লওয়াবের দরবারে গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে "হুজুর সরকার, এবার হুকম হৌক আমাদের কুস্তির লড়াইয়ের।"

লওয়াব বল্লে "বেশ, বেশ, কাল হোবে।"

তার পরদিন বিকালে নওয়াবের দরবারের সামনে কুস্তির জায়গা ঠিক হোলো। হাথি রমজানের লড়াই দেখতে মুল্লুকসুদ্ধু লোক জড় হোলো। চারিদিকে সোরগোল, চারিদিকে ঠেলাঠেলি, সবাই সামনে এগোবার চেষ্টা করছে। এমন সময় কাড়া নাক্কাড়া শিঙ্গা বেজে উঠলো। সিপাহি সোয়ার চারিদিকে ছুটলো। দেখতে দেখতে নওয়াব সাহাবের সওয়ারি এসে পড়ল। চারিদিকের লোক ঝুঁকে কুর্নিশ করে একবার চেঁচিয়ে বন্দেগি জানালো, তারপর সব চুপ।

নওয়াব এসে কুস্তির আখড়ার ধারে সিংহাসনে বসলো। খিদমতগার, খাওয়াস, চামর বরদার সব চারিদিকে ছুটাছুটি করে তার আরামের বন্দোবস্ত করলে। নওয়াব একটু জিরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—"সত্তুপুরের পালোয়ানরা কোথায় ?"

"হুজুর খোদাবন্দ" বলে লম্বা সেলাম ঠুকে ভুট্টা সিং এসে দাঁড়ালো।

"তোমরা আমার শহর দেখছ কেমন ? এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না তো ?"

"হুজুরের তো দুনিয়া মশুর (প্রসিদ্ধ) আর হুজুর সরকারের মেহেরবাণী (কৃপা) যার উপর পড়েছে তার সুখের সীমা নেই। সে কথা এ বান্দা হরঘড়ি (প্রতি মুহূর্তে) বুঝছে।" নওয়াব খুশী হয়ে বল্লে "বেশ, বেশ, তবে আর কিছুদিন আরাম করো। তারপর দেশে ফিরে যাও।"

ভুট্টা সিং ফের ঝুকে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে। "যো হুকুম খোদাবন্দ। তবে গোস্তাকি মাফ (অপরাধী ক্ষমা) করলে এ গোলাম একটা আরজি পেশ (নিবেদন) করে।"

নওয়াব বল্লে "বেশ, বেশ, নির্ভয়ে বলো।" পালোয়ান বল্লে "হুজুর রাজা সাহেবের হুকম ছিল এখানের কুস্তি দেখে যেতে।"

নওয়াব একথা শুনে একটু হাসলো। তারপর খানিক চুপ করে তামাক টানলো। চারিধারে একেবারে চুপ। কেউ কথা বলে না। তারপর নওয়াব বল্লো "তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই। হাথি রমজানের হিম্মতের কিছু খবর রাখো।"

ভুট্টা সিং ফের লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"হুজুর এ বান্দার জান (প্রাণ) ত মনিবের হাতে। আর গোস্তাকি মাফ করবেন। অনেক পালোয়ানের হিম্মত আমি দেখেছি, না হয় রমজানেরটাও দেখে নেবো।"

এই কথা শুনে নওয়াবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে একবার সিংহাসনের হাতলে ভর দিয়ে চোখ লাল করে তল্‌ওয়ার মুঠিতে চেপে ধরে, পালোয়ানের দিকে ঝুঁকলো, তার পরই

একটু হেসে বল্লো—"বেশ বেশ, তবে তোমরা সব তৈরী হও, আমি তোমাদের শিখ্লাবার (শিক্ষা দেবার) বন্দোবস্ত করছি।" এই বলে নওয়াব জোর গলায় হুকম দিলে—"রমজানকে হাজির করো।" বলে সে সিংহাসনে ঠেস দিয়ে গম্ভীরভাবে তামাক খেতে লাগলো।

সত্তুপুরের পালোয়ানরা তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো। ওস্তাদের লম্বা চৌড়া শরীর, প্রকাণ্ড বুক, লম্বা হাত, মহিষের মত ঘাড়। সে আখড়ায় নেমে একবার সেখানের মাটি মাথায় ঠেকালে, তারপর নওয়াবকে সেলাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত গুটিয়ে যে পথে হাথি রমজান আসবে সেদিকে তাকিয়ে অচল হয়ে রইলো। তার সাগির্দরাও ঠিক তারই মতো সব করলো।

অল্প দেরী হোলো, তারপর হঠাৎ দূরে একটা ভয়ানক চেঁচামেচি সোরগোল শোনা গেল। আওয়াজটা এগিয়ে আসতে ক্রমে দেখা গেল যে রাজার সড়ক (রাজপথ) দিয়ে চারটে হাথি আর এক দল বর্ষা বল্লমধারী সিপাহি, বিষম সোরগোল আর হুড়াহুড়ি করতে করতে আসছে। আরো কাছে এলে দেখা গেলো যে, ডাইনে দুই হাথি, বাঁয়ে দুই হাথি শিকলি ধরেছে আর তার মাঝে, সেই শিকলিতে বাঁধা হাথি রমজান গর্জাতে গর্জাতে চলে আসছে। তার দাপটে, শিকলি জঞ্জীরের ঝনঝনাতে আর সিপাহিদের "হঠ যাও, হঠ যাও" চিচকারে পথের দুধারের লোক প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই রকম গোলমাল করতে করতে রমজান কুস্তির আসরে এসে পৌছাল।

পাঁচ হাথ লম্বা, চার হাথ ছাতির বেড়, ছ মন ওজন, লাল ভাঁটার মতো দুই চোখ,—তার উপর সে দুটো ক্রমাগত ঘুরছে—বাঘের মতো মোছ (গোঁফ)। তারপর লড়াইয়ের নামে সে ক্ষেপে রয়েছে,—তার গায়ের লোম খাড়া, আর সে ক্রমাগত গজরাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত ঘষছে ঠিক যেন একটা হাথি মস্ত (মত্ত) হয়েছে। আসরের ধারে এসে সে প্রথমে নওয়াবকে সেলাম করলে, তারপর এদিক ওদিক মাথা ফিরিয়ে খুঁজতে লাগলো, কে চায় তার সঙ্গে লড়তে।

সত্তুপুরের পালোয়ানরা তার নজরে পড়তেই সে কোমরের শিকলিতে টান মেরে, সেদিকে ঝুঁকে, বেশ ভাল করে তাদের দেখে নিলে। দেখা হয়ে গেলে হঠাৎ সে ভয়ানক জোরে হো হো করে হেসে উঠলো, আর তার পরেই মুখ চোখ লাল করে ঘাড় বেঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে, ভীষণ গর্জন করে সত্তুপুরের পালোয়ানদের দিকে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলে—ঠিক যেন একটা বুনো বাঘ শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ছে।

তার চেহারা দেখে আর গর্জন শুনে চারিধারের লোকের মধ্যে ভয়ের চিৎকার শুনা গেলো, আর সত্তুপুরের পালোয়ানদের মধ্যে এক ওস্তাদ বাদে আর সবাই পালিয়ে ভেগে গেলো। ওস্তাদেরও মুখ সাদা, গায়েও ঘাম ছুটছে, কিন্তু সে ইজ্জত বাঁচানর জন্যে তখনো দাঁড়িয়ে রইলো। চারিদিকে যখন এই মতো গণ্ডগোল, তখন নওয়াব সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে জোরে হেঁকে বল্লো—"খবরদার বেয়াদব বেতমিজ, চুপ রও।"

মনিবের তাড়া খেয়ে ডালকুত্তা যেমন চুপ হয়ে যায়, তেমনি নওয়াবের ধমকে রমজানও আড়ষ্ট হয়ে গেলো। নওয়াব খানিক তার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, ফের এসে বসলো। বসে হুকম দিলে—"লোহারকো বোলো শিকলি খুলে দিতে।" লোহার গিয়ে শিকলি খুলে দিলে। মাহুতরা হাথি নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। রমজান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নওয়াব হুকুম দিলে—"হাথ লাও।"

কট্‌মট্‌ করে তাকাতে তাকাতে, ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, রমজান আস্তে এগিয়ে ভুট্টা সিং-এ দুই হাত চেপে ধরলে।

নওয়াব বল্লে, "তফাত যাও"। রমজান সরে দাঁড়ালো। নওয়াব ফের ভুট্টা সিংকে জিগ্যেস করলে—"কি লড়বে তুমি? ওস্তাদের তখন মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না, সে মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝালো যে সে লড়তে চায়।

নওয়াব একবার মুখ বেঁকিয়ে বল্লে—"রমজান লড়ো"। হুকম পাবামাত্র রমজান বাঘের মত গর্জিয়ে, তোপের মতো আওয়াজ করে তাল ঠুকে ভীষণ দাপটের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আখড়া তোলপাড় করে ফেল্লে। সত্তুপুরের ওস্তাদও তাল ঠুকবার, পাঁয়তারা কষবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তখন তার ধড় থেকে জান বেরোবার মতো হয়েছে, পা আর চলে না, হাথ আর নড়ে না।

দুচার দশবার লাফালাফি করে হঠাৎ মোড় ঘুরে ভয়ানক তেজে হুমকী দিয়ে রমজান ভুট্টা সিং-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভুট্টা সিং ঝুঁকে, দু পা ফাঁক করে, হাথ এগিয়ে রমজানের হমলা (আক্রমণ) সামলাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার হাথ পুরো এগোবার আগেই রমজানের দুই লম্বা হাথ তার ঘাড় গর্দান বেড়িয়ে, পিঠের উপর দিয়ে ঘুরে, তার দুই বাজু চেপে ধরলো। তাকে এরকম করে ধরে রমজান খানিক চুপ করে দাঁড়ালো। তারপর দুই ঝাঁকিতে সত্তুপুরের ওস্তাদের পা মাটি থেকে ছাড়িয়ে এক ঝটকায় তাকে মাথার উপর শূন্যে তুলে ধরল! চারিধার তখন চুপ, সবাই দম বন্ধ করে দেখছে যে কি হয়।

ছোট ছোট চোখ। কথায় কথায় সে হাসে, আর হাসলেই তার চোখ যায় লুকিয়ে, এই রকম ত ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ের চেহারা। সে যখন সভায় এসে সেলাম করে "মহারাজ কী জয়

ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে

হৌক" বলে দাঁড়ালে, তখন সভাসুদ্ধ লোক ত তাকে দেখে অবাক।

ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে ব্যাপার বুঝে একটু হেসে বল্লো "আমার আছে আড্-ঢাই প্যাচ। এ পর্যন্ত দেড় প্যাচের বেশীর খরিদ্দার জোটে নি। হুজুরের কৃপায় পুরা আড্-ঢাই প্যাচের খরিদ্দার পাইতো খুশী হয়ে দেশে ফিরে যাব।"

এ কথায় রাজার ভরসা বাড়লো। সে তখনি পাঁড়েজীর দরুন বলম্‌বটেরের নওয়াবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে লেখা ছিলো—"শিখ্‌বার জন্যে যাকে আপনার কাছে পাঠালাম, তাকে তো আপনার পালোয়ান যা জানে তাই শিখ্‌লালো। এখন আপনার পালোয়ানকে শিখ্‌লাবার জন্যে আমার কাছে লোক মওজুদ। যদি হুজুরের অনুমতি হয় তো তাকে পাঠাই।"

নওয়াব চিঠি পড়ে রেগে লাল হয়ে উঠলো। তারপর একটু হেসে জবাব দিলো "বেশ বেশ। ওস্তাদকে পাঠিয়ে দিন। যদি হুজুরের দেশে রমজানকে শিখলাবার মতো ওস্তাদ কেউ থাকে তো সে শিখিয়ে যাবে। শিখ্‌লাবার মতো জ্ঞান যদি তার না থাকে তা হলে সে ফিরে যাবে কি না সন্দেহ।"

রাজা ভেট্‌কুয়ারকে জবাব পড়ে শুনালো। শুনে পাঁড়েজী চোখ মুঁজে দাঁত বার করে হেসে বল্লো—"সবই তো বাবা টঙ্করনাথের হিচ্ছা (ইচ্ছা)! শিখতে হয় শিখবো। শিখ্‌লাতে হয় শিখ্‌লাবো।" তারপর লোক লস্কর সঙ্গে নিয়ে ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে একদিন বলম্‌বটেরের দরবারে হাজির হোয়ে সেলাম করলে।

তার সাড়ে তিন হাথ শরীরের উপর দেড় হাথ পাগড়ি। এই অদ্ভুত চেহারা দেখে নওয়াবের দরবারসুদ্ধ লোক ত হেসে উঠলো। ভেট্‌কুয়ার এদিক ওদিক দেখে, নওয়াবের দিকে ফিরে, চোখ মুঁজে, দাঁত বের করে খুব জোরে হাসলো। তার হাসির চোটে সবাই অবাক হয়ে চুপ করে গেলো। তখন সে ফের নওয়াবকে সেলাম করে বল্লে—"আমাকে দেখে হুজুর আর হুজুরের দরবারের সকলের এত আনন্দ্ হোয়েছে দেখে বড্ডো খুশী হলাম। এখন সরকার (প্রভু) আজ্ঞা করুন আপনার পালোয়ানও আমায় খুশী করুক।"

নওয়াব বল্লে—"বেশ, বেশ, কালই হোবে।"

পরদিন সেই আগেকার মত ভিড় গণ্ডগোল বাধলো। আবার নওয়াব এসে ভেট্‌কুয়ারকে লড়বে কিনা জিগ্যেস করলে। তারপর তাকে তৈরী হতে বলে, রমজানকে আনতে হুকম দিলে।

ভেট্‌কুয়ার যখন তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো, তখন তাকে দেখে নওয়াবের একটু চোখ ফুটলো। নওয়াব দেখলে যে, তার পা দুটো ছোট আর বেকা, কিন্তু তার বদনটা (দেহ)

অসম্ভব হিম্মতি জোয়ানের। তার ঘাড় গর্দান, ছাতী, পিঠ সব যেন পেটা লোহার তৈরী, আর সব জায়গায় যেন বড় বড় সাপ খেলে বেড়াচ্ছে। তার হাথ দুটো ত যেন দুটো জ্যান্ত অজাগর সাপ।

কালু বল্লে—"সাপ কিরে? কি বলে?"

মণ্টু তাচ্ছিল্য করে বল্লে—"বুঝলি না! মসল্ প্লে।"

দারোয়ানজী তাদের দিকে একটু তাকিয়ে ফের বলতে লাগলো—"এদিকে হাথিতে ঘেরা রমজান তো হুল্লোড় করতে করতে এগিয়ে এলো। পাঁড়েজী সে দিকে দেখে গম্ভীর ভাবে নওয়াবকে বল্লে "হজুরের দেশে বুঝি কুস্তির আগে ভাল্লুক নাচের রীত আছে? আমাদের দেশে তো মানুষে ভাল্লুক নাচায়, হজুর তো দেখি হাথিকে ভাল্লুক নাচান শিখ্লিয়েচেন।"

তারপর রমজান এসে পৌঁছে ত গর্জন লাফ ঝাঁপ দাঁতে দাঁত ঘষা আরম্ভ করলে। ভেট্কুয়ার মোছে (গোঁফে)। তা দিতে দিতে বেশ মন দিয়ে তাকে দেখতে লাগলো, ঠিক যেন সে একটা চিড়িয়াখানায় নতুন জানাওয়র (জানোয়ার) দেখছে।

রমজানের শিকলি খোলা হাত মিলানো সবই হোলো। ভেটকুয়ার বেশ সহজ ভাবেই সব করলো; তারপর নওয়াবের হুকমে যখন রমজান লড়তে নেমে লাফা লাফি গর্জন আরম্ভ করলো তখন ভেট্কুয়ার তার দিকে ফিরে চোখ মুঁজে দাঁত বার কোরে খুব হেসে উঠলো যেন সে কতই আমোদ পাচ্ছে। হেসেই সে হাত তালি দিয়ে তালে তালে বোলতে লাগলো—"বাহ্রে বেটা, বাহ্, বাহ্; নাচে ভালু নাচে ভালু, নাচে মেরে ভালুয়া।"

আসরসুদ্ধ লোক ত অবাক! রমজান তো এমনিতেই ক্ষেপে ছিলো, এসব দেখে শুনে সে আরও ভয়ানক বেগে ক্ষেপে, হাঁ করে গর্জন করে, রাচ্ছসের (রাক্ষসের) মতো হুমকি দিয়ে ভেট্কুয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পাঁড়ে সট কোরে—যেন ডুব মেরে—রমজানের পায়ের ভিতর দিয়ে গলে পেছনে চলে গেলো,—যেন ছু-মন্তর, এই ছিল সামনে, এই গেল পেছনে। পেছনে গিয়ে ছোট এক পা তুলে রমজানের পেছনে এক লাথি লাগালো। লাথির চোট আর নিজের বেগ না সামলাতে পেরে রমজান গদ্দাম করে পড়ে গেলো। তা দেখে ভেট্কুয়ার নওয়াবের দিকে ফিরে, চোখ মুঁজে বত্তিশটা দাঁত বার কোরে, বিনা আওয়াজে হাসতে লাগ্লো, মনে হোলো যেন সে নওয়াবকে ভেংচাচ্ছে।

আছাড় খেয়ে রমজানের চেঁচান বন্ধ হোলো। সে মুখবন্ধ করে দস্তুর মাফিক লড়তে

লাগলো। কিন্তু কি করবে? ভেট্‌কুয়ার ঠিক ভেল্কি বাজির মতো সড়াক সড়াক এদিক ডুব ওদিক গোঁত্তা খেয়ে তাকে এড়িয়ে তার প্যাচ ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

পেছনে গিয়ে ছোট এক পা তুলে রমজানের পেছনে এক লাথি লাগালো।

—মণ্টু বল্লে "সাইড স্টেপিং। লোকটা নিশ্চয় বক্সিং জানতো।"

দারোয়ানজী চটে বল্লে "ফের বোক সিং। সে বেটা কুস্তির কি জানে? বোক সিং এর বাপ এলেও এরকম লড়তে পারতো না। শুনবে তো শোনো।"

কালু বল্লে "হাঁ, হাঁ, শুনবো! মণ্টু তুই চুপ কর!"

দারোয়ানজী বলতে লাগলো—এই মতো ত লড়াই চল্লো। যদিই বা রমজান কোনও রকমে ভেট্‌কুয়ারের বদনের কোথাও হাথ লাগায়, তো সেখানে ঠিক যেন সাপ কিল্‌বিল্ করে খেলে উঠে আর রমজানের হাথ খুলে যায়। ভেট্‌কুয়ার সরে গিয়ে কেবল লাথি চালায় আর হাসে। হাথ একবারও উঠায় না। খানিকক্ষণ এ রকম হবার পর রমজান আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। সে আবার গর্জন করে, দু হাথ বাড়িয়ে ভেট্‌কুয়ারের উপর লাফিয়ে পড়লো, যেন সে তাকে চেপে পিষে মারতে চাহে।

রমজানের লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে "জয় বাবা টঙ্করনাথ" বলে চেঁচিয়ে ভেট্‌কুয়ার ঠিক বিজ্‌লীর চমকের মত, এক গোঁত খেয়ে রমজানের দুই পায়ের মাঝে ঝুঁকে নিজের ঘাড় ঢুকিয়ে দিলে, দেখে মনে হোলো যেন রমজান তার পিঠে সওয়ার হয়েছে। তারপর পলকের মধ্যে এক ভীষণ ঝটকায় সে সোজা হোলো, আর রমজান ঠিকরে আসমানে উঠে তিন চার ঘুমন্তি (ডিগবাজী) খেয়ে গদ্দাম করে আছড়িয়ে চিত হয়ে পড়লো।

তখন ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে নওয়াবের সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে সেলাম ঠুকে বল্লে—"হজুর ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে তো জানে আড়্‌-ঢাই প্যাঁচ, আধা প্যাঁচে তো সরকারের পালোয়ান চিত হয়ে গেলো, এখন হুকম হোক জনাবের, অন্য কেউ আসুক বাকী দুই প্যাঁচ তাকে শিখ্‌লায়ে দি।"

নওয়াব ত এতক্ষণ মন্তর ফুকা সাপের মতো আড়ষ্ট হয়ে ছিলো। পাঁড়েজীর কথায় উঠে বসে সে তার তারিফ (প্রশংসা) করে, তাকে শাল, দোশালা দিয়ে বল্লে—"আমি তোমার কুস্তি দেখে খুশী হয়ে গেছি। তুমি ফিরে যাও। আমি রাজা সাহাবকে চিঠি দিচ্ছি।"

ভেট্‌কুয়ার চিঠি নিয়ে সত্তুপুরে ফিরে এলো। চিঠিতে ছিলো—"যে শিখতে এসেছিলো, সে শিখে গিয়েছে। যে শিখ্‌লাতে এসেছিলো সে শিখ্‌লিয়ে গিয়েছে। সাবাস হজুর। আমি আসবো হজুরের সঙ্গে হাত মিলাতে।"

রাজা চিঠি পড়ে ভেট্‌কুয়ারের পাগড়িতে নিজের শিরপ্যাঁচ লাগিয়ে দিলো। তারপর তাকে দশ হজার মোহর, শাল, দোশালা, জওহরাত (মণিমুক্তা) ইনাম (বকশিশ) দিয়ে হাথির উপর বসিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলো।

মন্টুর ছোট কাকা বিমলবাবুর হঠাৎ ভয়ানক শিকারের শখ হোলো। এ রকম শখ তাঁর প্রায়ই হোতো আর তাঁর নিজের তরফ থেকে বাধা না পাওয়া পর্যন্ত পুরো দস্তুর চলতো। যাহোক এইবার অনেক বন্দুক কেনার পর, তিনি একটা নতুন রকমের রাইফল্ বন্দুক মেশান অস্ত্র বিস্তর দাম দিয়ে কিনলেন। বড়দের বৈঠকে সেটা এনে তার কত গুণ সে সব তিনি পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন। কেমন সেটাতে বন্দুক রাইফল্ দুইয়ের সব গুণ আছে, কোন্ সাহেব সেটা দিয়ে কটা বাঘ, কটা সিংহ মেরেছে, ওর একগুলি খেয়ে বড় বড় হাতী কটা ডিগবাজী খায়, এ সব বলা হোলো। আর আমাদের মন্টু মাস্টার এক কোণে বসে দু কানা খাড়া করে সব শুনলো। তার পরের রবিবার দুপুরে, তাদের সেই বাইরের বারাণ্ডায় বসে মন্টু তার সাঙ্গপাঙ্গদের সামনে বন্দুক রাইফল্ ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব বক্তৃতা চালালো।

মন্টু বল্লে, "বন্দুক জিনিসটা কিছুই নয়, বন্দুক ছোঁড়া ত ছেলে খেলা। রাইফল্? হাঃ, সেটা একটা জোয়ান মরদের উপযুক্ত অস্তর। দুটোয় তফাত কতো, খুব ভাল বন্দুক দিয়েও দেড়শ গজের বাইরে একটা চড়ুই পর্যন্ত মারা যায় না, আর ভাল রাইফেলের গুলিতে পাঁচ মাইল দূরের হাতীও মারা যায়।"

শেষের কথাটা শুনে কালু বল্লে—"পাঁচ মাইল না পঞ্চাশ কোশ! ভাগ!"

মন্টু চটে বল্লে—"চুপ কর! বন্দুক রাইফল্ কাকে বলে তুই জানিস?" লালু আস্তে আস্তে বল্লো, "রাইফেলের একটা নল। বন্দুকের দুটো নল।"

মণ্টু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লো, "তুই আরেক বুদ্ধিমান! খুব তফাত বুঝেছিস যাহোক। শোন তবে, বন্দুকের নলের ভেতরটা একেবারে ঝকঝকে প্লেন, রাইফেলের নলের ভেতর ইস্ক্রুপের মত প্যাঁচ কাটা আছে, সেই জন্যে তার গুলি ফর্ ফর্ করে ঘুরতে ঘুরতে বেরোয়।"

কালু বল্লে—"ঠিক যেমন তোর মুণ্ডুর ভেতর প্যাঁচ কাটা আছে, তাই তোর মুখ দিয়ে ফর্ ফর্ কোরে কথা বেরোচ্ছে।"

মণ্টু মহা রেগে বল্লে—"ফের না জেনে শুনে যা-তা বলছিস, ইস্টুপিড কোথাকার! আলবাত প্যাঁচ আছে রাইফেলের ভেতর।"

"যা যাঃ ভাগ! ওসব পট্টি তুই লালু গণেশ, এদের কাছে লাগাস।"

"তবে কিসের জন্যে বন্দুকের চেয়ে রাইফল্ ভালো বল দেখি ?"

"রাইফল্ ভালো না আরো কিছু! রাইফেলে একটা গুলি ছুঁড়ে, ব্যস! বসে থাকো চুপ করে। আর বন্দুকে দুটো গুলি চালান যায়।"

"এই বিদ্যে নিয়ে ওস্তাদি করছিস ? জানিস, রাইফেলে এক সঙ্গে পাঁচটা গুলি পোরা হয়, সেগুলো একের পর এক গুড়ুম গুড়ুম করে ছোঁড়া যায়।"

"পাঁচ পাঁচটা গুলি, আর ঠিক চীনে পটকার মত ফট্ ফট্ কোরে—উঃ কি গাঁজাখুরি—"

"চুপ কর বোকা গর্দভ কোথাকার।"

"তুই চুপ কর, আফিংখোর মেড়া।"

ক্রমে ত মহা হট্টগোল, হাতাহাতির উপক্রম। বাড়ির দারোয়ানদের জমাদার রামগিদ্ধড় সিং এতক্ষণ সেখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। গণ্ডগোলে তার ঘুম ছুটে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে—"আরে আরে, এত্তো সোরগোল কেন ? কি হইয়েছে ?"

কালু বল্লে—"কি আবার হবে। এই মণ্টু গাধাটা বলে কিনা রাইফেলের নলের ভেতরে ইস্ক্রুপের মত প্যাঁচ কাটা আছে।"

জমাদার বল্লো—"হো, রাইফোল ? তা মণ্টু দাদা তো ঠিক বলেছে। রাইফোলের ভিতরে গুরূপ আছে, সে তো প্যাঁচ কাটারই মত।"

মণ্টু মহা খুশী হয়ে বল্লো, "দেখলি তো ? গাধা কোথাকার!' গণেশ এতক্ষণ ব্যাপার গুরুতর দেখে চুপ করে ছিলো। দাদার জিত হয়েছে বুঝে সে বললে—"জমাদার, বন্দুক ভালো না রাইফল্ ভালো ?"

জমাদার বল্লে, "বন্দুক ভালো। পল্টনে সব সিপাহি লোগের কাছেই রাইফোল থাকে। বন্দুক শুধু বড়ো বড়ো অফসর লোগের থাকে।"

কালু লাফিয়ে বল্লে, "কিরে খুব যে চাল দিচ্ছিলি, এবার কি হোলো? মণ্টু সাক্ষী বিগড়েছে দেখে বিষম অপ্রস্তুত। কাজেই সে আরো জোরে বল্লো,—"হ্যাঃ, ও বুড়ো কি জানে, ও কটা বন্দুক রাইফল্ দেখেছে।" ছোটো কা' বলে রাইফল্ ভাল, তার কতগুলো আছে জানিস?" কালু চুপ করে জমাদারের দিকে তাকাল। জমাদার খুব উদাসভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে বল্লো,—"হ্যাঁ, ছোটবাবু ত সেদিন পর্যন্ত কাঠের বন্দুক কাঁধে কোরে, হামার লাঠিটাকে ঘোড়া বানিয়ে হেট হেট করেছে, আজ সে দু চারটা বন্দুক রাইফোল কিনে বহাদুর বনে গেছে, আর হামি মুখ্খু বুঢ়া, হামি রাইফোল বন্দুকের কি দেখেছি, কি জানি?"

এই বলেই সে কালুর দিকে ফিরে বল্লো—"কালুদাদা! জানো তুমি, হামি বর্মা মুলুকে লড়াইয়ে গিয়েছিলো। সে ফৌজে ছিল, এই ত্রিশ চালিশ হজার রাইফোল, দো এক হজার পিস্তৌল, তিন চার হজার বন্দুক, দো তিন শৌ তোপ, আরো কত্তো কি। তার মধ্যে কিছু তো না, হোক তোভি, পাঁচ দশ হজার তো হামি দেখেছি। আর, ছোটবাবুর তো দাঁতই উঠলো সেদিন, সে কি এত দেখেছে?"

গুণতিতে জমাদার তাকে এক হাত নিলো দেখে মণ্টু তখন বল্লে—"ওঃ, ভারী ত জিনিস সে সব। ছোট কা' সেদিন যেটা কিনেছে তার দাম দেড় হাজার টাকা, ও রকম জিনিস দেখেছো কখনো?"

দারোয়ানজী গম্ভীর ভাবে বল্লো—"না দেঢ় হজার টাকার বন্দুক তো দেখিনি বাবা তবে সওয়া দো হজার অসরফি দামের বন্দুক একটা দেখেছি। অরে এক অসরফি মোহরের দাম ছাব্বিশ টাকা, যাকে খুশী জিগ্যেস করে নাও।" গণেশ এই শুনেই চট করে সওয়া দুহাজারকে ছাব্বিশ দিয়ে গুণ করে বল্লে—"আটান্ন হাজার পাঁচশো টাকা। বাপস্! দাদা তুমি একেবারে হেরে গেছো।" মণ্টু জোরে মাথা নেড়ে বল্লে "সব বাজে কথা। বন্দুকের অত দাম হতেই পারে না।"

দারোয়ানজী আরও গম্ভীর হয়ে বল্লো—"নাঃ, কি কোরে হোবে? দুনিয়ার যত্তো বন্দুক সব দেখেছে তুমি আর তোমার ছোট কাকাবাবু, আর আমি রাজপুত, বন্দুক তলওয়ার হামার পেশা, হামি কি জানি? শুনেছো কখনো 'বব্বরখোর' বন্দুকের নাম?"

নাম শুনে মণ্টুর চক্ষুস্থির! কালু জিগ্যেস করলে—"সেটা কি রকম বন্দুক জমাদার?"

জমাদার—"শুনবে তার কথা ?" বলতেই সবাই—"হ্যাঁ শুনবো, শুনবো" বলে এগিয়ে বসলে। তখন জমাদার সোজা হয়ে বসে, দু চারবার গোঁফে চাড়া দিয়ে বলতে আরম্ভ করলো :—

"বহুত দিন আগে দিল্লী শহরে এক বন্দুকের কারিগর ছিল, তার নাম খাজা রওশন জুস্। তার তৈয়ারী বন্দুক সব দুনিয়াভর মশুর (প্রসিদ্ধ) ছিল। সে অন্য কারিগরদের মত খারাপ ভাল সব রকম বন্দুক বানাতো না। তার বন্দুকের ইস্পাত থেকে কোঁদাই, ঢালাই, পিটাই সব সে নিজে দেখতো আর সমস্তক্ষণ মন্তর আওড়াত। এই রকম সারা বচ্ছর মেহন্নত কোরে যে বন্দুক তৈরী হোতো সেটা সে নিজে পরিচ্ছা (পরীক্ষা) কোরে তার একটা নাম দিতো। সে সব বন্দুক সোনা-রূপার দামে বিক্রি হোতো। একবার এই রকম কোরে একটা বন্দুক তৈয়ারী হলো, নাম সে দিলো 'বব্বরখোর !' বব্বরখোর মানে যে বব্বর সিংঘিকে (সিংহ) খায়। লক্ষ্ণৌয়ের লওয়াব (নবাব) সেটা সওয়া দো হজার অসরফি দিয়ে কিনে নিয়ে গেলো। তারপর যখন কম্পনি বহাদুর লওয়াবকে লক্ষ্ণৌ থেকে তাড়িয়ে দিলে, তখন সেটা গিয়ে পড়লো ঘাসবনৌলির জমিদার চৌধরি বজরবণ্ট্ সিং-এর কাছে। চৌধরি বজরবণ্ট্ সিং ছিল প্রকাণ্ড জোয়ান লোক। আর যেমন তার চেহারা তেমন ছিল তার সাহস। তারপর সে ছিল তগা ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ), একেবারে খাস দরোন্ আচারের সন্তান।"

গণেশ বল্লে—"কিসের আচার বল্লে, জমাদার।"

"অরে, রাম, রাম ! আচার নয়, দ্দরোন আচার, দ্দরোন আচারিয়, মহাভারত জানো না ? ইস্কুলে লিখ্খা পড়া তবে কি শিখ্লাচ্ছে ?"

কালু বল্লে—"কিরে বাবা ! মহাভারতে আচার কাসুন্দির কথা আবার কোথায় ?"

জমাদার হতাশ ভাবে বল্লে—"হত্তেরী ! বঙ্গালীর ধরম, বিদ্যা কিচ্ছু নাই ! অরে দরোন আচার ছিলো কুরু-পাণ্ডব লোগের গুরু, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এদের লড়তে শিখ্লাতো।"

মণ্টু চট করে গম্ভীরভাবে বল্লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুমি দ্রোণাচার্যের কথা বলছো।"

জমাদার বল্লে—"বুঝেছো তো চুপ কেন করেছিলে ?" এই বলে সে ফের আরম্ভ করলে—"হ্যাঁ চৌধরি বজরবণ্ট্ সিং, দরোন আচারের সন্তান, তার ওপর সে পেয়ে গেলো সেই বব্বর-খোর বন্দুক। কাজেই মস্ত শিকারী বলে তার নাম জাহির হোয়ে গেলো। বড়ো বড়ো বাঘ, বড়ো বড়ো হাথি, ইয়া ভারী গণ্ডার এই সব সে শিকার খেলতো। কলকত্তার বাবুদের মত কবুতর (পায়রা) আর জঙ্গলী বত্তক (হাঁস) মেরে বহাদুর বনতো না। অনেক দিন পর

আমার পল্টনের এক অফসর, কাপ্তান উটরাম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চৌধরিজীর দেশে শিকার খেলতে গেলো।

কালু বল্লে—"তোমার কাপ্তান বুঝি হিন্দুস্থানি ছিলো?"

মণ্টু বল্লে—"আঃ, জিগ্যেস করছিস কেন, দেখছিস না নামের শেষে রাম রয়েছে?"

গণেশ বল্লে—"কেয়া শ্রেণ্ড নাম, দাদা, উটরাম।"

জমাদার এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলো, ব্যাপারটা বুঝে সে হঠাৎ মাথা ঝাঁকি দিয়ে বল্লো—"আরে না না! উটরাম, সাহাব খাস বিলাতি গোরা। জণ্ডেল উটরাম, যার নামে গঙ্গাজিতে ঘাট আছে ইডেন বাগানের কাছে, যার পাথরের মূর্তি আছে ময়দানে, হামার কাপ্তান তার ভাই কি ভাইপো লাগতো।"

ছেলেরা খানিক এ ওর মুখ চাওয়া-চাওই করলো হঠাৎ মণ্টু হো হো করে হেসে বল্লো—"ওরে বাবা, জেনারেল আউট্রাম (Outram), জমাদারের পাল্লায় পড়ে 'উটরাম' হয়ে গেছে।" সবাই তো খুব হেসে নিল। জমাদার বেজায় গম্ভীর হয়ে চুপ করে খইনি ডলতে লাগলো।

সে থেমে গেলো দেখে লালু বল্লে—"তারপর কি হলো জমাদার?"

জমাদার গম্ভীর ভাবে বল্লো—"মণ্টুদাদাকে জিগ্যেস করো। হামার কাপ্তানের নামও সে হামার চেয়ে ভালো জানে যখন তখন সব গল্পটাও জানে।"

কালু বল্লে—"কেন শোন তুমি ওর কথা জমাদার ওটা একটা গাধা।"

এ কথায় খুশী হয়ে জমাদার ফের বলতে লাগলো—"কয় দিন তো শিকার বেশ চল্লো। আমাদের সঙ্গে শিকারের জন্যে আর জিনিস পত্তর নিয়ে যাবার জন্যে আটটা হাথি ছিলো, রোজ আমরা নতুন নতুন জায়গায় তাম্বু ফেলে ছাউনি করে ঘুরতাম। এক দিন অমনি করে এক গাঁয়ের কাছে আমরা এলাম। সে গাঁয়ে লোক জন নেই, প্রায় সব বাড়ি ঘর ভাঙ্গা আর ক্ষেত-টেত নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে। অনেক খুঁজে একটা বুড়োকে পাওয়া গেলো। সে বল্লে যে একটা বুনো পাগলা হাথির অত্যাচারে তাদের গাঁয়ের এই অবস্থা। তার ভয়ে সবাই পালিয়েছে, কেবল সে বুড়ো বলে পালাতে পারেনি। রোজ হাথিটা এসে বাড়ি, ঘর, ক্ষেত সব নষ্ট করে, আর মানুষ ধরতে পারলে তাকে মেরে খেয়ে ফেলে।

মণ্টু বল্লে—"দূর হাতী তো নিরামিষ খায়, মানুষ খাবে কি কোরে?"

জমাদার বল্লে "এ হাথিটা নিরমিষ খেতো না। মানুষ খেতো।"

মণ্টু বল্লে—'পাঁচটা হাতী যখন নিরামিষ খায় তখন সব হাতীই নিরামিষ খায়।"

জমাদার রেগে বল্লে—"হ্যাঁ ! তুমি তো সব জানো। আমি নিরামিষ খাই, তুমি মছলি খাও, নাগারা কুত্তা খায়, বির্‌হরা বাঁন্দর খায়, চীনারা অরসুল্লা খায়, বর্মারা ঘড়িয়ার (কুমির) খায়, সবাই তো মানুষ আছে ? মানুষের খাওয়া তফাত হোতে পারে। হাথির পারে না ?"

মণ্টু ত চুপ হয়ে গেলো। জমাদার বলতে-লাগলো—"কাপ্তান সাহাব এ সব শুনে বল্লে, 'বহুৎ ঠিক হ্যায়। হাম হাঠিকা শিকার খেলেগা। হিয়া ছাউনি করো।"

"রাত্তিরে চারিদিকে আগুন জ্বেলে ছাউনির পাহারা ঠিক রাখা হোলো। মাঝ রাত্তিরে বড় মাহুত এসে সাহাবকে বল্লে যে, কোন বুনো হাথি কাছে এসেছে তাই আমাদের হাথিগুলো বড় অস্থির হয়েছে। আমরা উঠে দেখি সব হাথিগুলো গটর গটর, ফোঁস ফোঁস, গোঁ গোঁ করছে। চারিদিকে চাঁদের আলো, কিন্তু বুনো হাথি কোথাও নেই। খানিক পরে হঠাৎ একটা ভয়ানক জোর চিচকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাথিগুলো মহা সোরগোল লাগিয়ে দিলো। হাথি ঘোড়ার চেঁচামেচি, শিকলির ঝনঝনা, মাহুত লোগে 'হোঃ বেটা, হোঃ মেরে বাবা' এই সব চলেছে, এমন সময় একটু দূরে এক টিলার (ঢিপি) ওপর প্রকাণ্ড কালো একটা কি দেখা গেলো। সেটা যখন এগিয়ে আসছে তখন আমাদের হাথিগুলো শিকলি ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে লাগলো ব্যাপার দেখে কাপ্তান সাহাব নিজে বন্দুক আওয়াজ করলে আর হুকম পেয়ে আমরাও করলাম। প্রথমে বন্দুক আওয়াজ হতেই বুনো হাথিটা গর্জিয়ে উঠলো। তারপর আট দশটা আওয়াজের পর হঠাৎ ফিরে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। পরদিন সকালে সেই ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল, সঙ্গে কয় জন লোক নিয়ে এসে কাপ্তান সাহাবকে অ.রজি (অনুরোধ) করলে হাথিটাকে মেরে দিতে। কাপ্তান বল্লে—'হাঠি কাঁহা হ্যায়, টুমলোগ দেখানে সক্‌টা' ?"

"হ্যাঁ হজুর দেখানে সক্‌তা।"

"কাপ্তান 'অলরৈট' বলে মাহুতকে হাথি সওয়ারির জন্যে ঠিক করতে বল্লে। বড় মাহুত সেলাম ঠুকে বল্লে যে সে হজুরের হুকম তামিল করতে এখনি রাজি, কিন্তু তার হাথিগুলো বুনো পাগলা হাথির সামনে ঠিক থাকবে কিনা সন্দেহ। যদি হাথিগুলো বিগড়িয়ে যায় তা হলে সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। ব্যাপার বুঝে কাপ্তান বল্লে ও ড্যাম ! যাও, নেহি মাংটা হাঠি, ঘোড়া তৈয়ারী করো।"

"ঘোড়া এলো। সাহেব ঘোড়ায় আর বাকী সবাই হেঁটে চল্লো। কতদূর গিয়ে গাঁয়ের সীমানা পার হোয়ে আমরা একটা নালার ধারে পৌছালাম। জায়গায় জায়গায়, ইয়া ভারী

ভারী হাথির পায়ের দাগ। যখন আমরা জঙ্গলের সীমানায় এসেছি তখন কাপ্তান ঘোড়া থামিয়ে ভাল দোনলা রাইফোল্‌টা হাতে নিয়ে তার গুলি বারুদ সব ঠিক আছে দেখে, সেটা কাঁধে রেখে তারপর ঘোড়া চালালো।"

"তারপর ক্রমে জমি উঁচা-নিচা, চড়াই-উতরাই শুরু হোলো। বড়ো বড়ো গাছ, ঝাড়, ঝোপ, ভব্বর ঘাসের জঙ্গল, এই সব চারিদিকে দেখা গেল। এ সব পার হোয়ে এমন একটা জায়গা এলো যেখানটা জঙ্গল ঝাড়ে ঘেরা! মাঝ খানে সেই নালা, তার এপারে এক জায়গায় কতকগুলো খুব বড়ো বড়ো পাথর আছে, সেগুলোর নিচে নালার অনেকটা জল এক জায়গায় জমে আছে, তার দুপাশ দিয়ে ঝিরঝির কোরে বালির উপর অল্প জলের স্রোত চলেছে। নালার ওপারে ভয়ানক জঙ্গল, আর এপারেও পাথরগুলো ছাড়িয়ে একটু পরেই খুব বড় বড় ঘাস, আর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। গাঁয়ের লোকেরা আর এগোতে চাইলে না। তারা বল্লে হাথিটা এই থানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সেটা দিনের বেলায় এই থানে জল খায় আর চান করে। সাহাব বল্লে—'টুমলোগ পেঁড় (গাছ) পর চড়কে ডেখো হাঠি কি ধর হ্যায়। হাম নালাকা কিনারাসে ডেখটা'।"

"আমরা সবে গাছে উঠেছি, আর সাহেব নালার ধারে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটা বেঁধে রাইফোল্‌ হাতে এদিক্‌ ওদিক্‌ দেখছে, এমন সময় পাঁচটা বম্বই মেলের মত আওয়াজ করতে করতে একটা পাহাডের মত প্রকাণ্ড হাথি হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কাপ্তানের দিকে ভয়ানক জোরে তেড়ে গেল। সাহাব বোঁ করে ফিরে হাথির মাথা তাক্‌ কোরে রাইফোল্‌ চালালো। গুলি খেয়ে হাথিটা একটু থামতেই সাহাব ফের গুলি চালালো। কিন্তু ঐ দামী বিলাতি রাইফোলের দুই গুলি খেয়েও হাথি মরলো না। দেখতে দেখতে ফের সেটা শুণ্ড তুলে চিচকার কোরে কাপ্তানের ওপর গিয়ে পড়লো। ঘোডাটা ভড়কে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে মাঝে পডেছিলো, হাথি এক ভীষণ ধাক্কায় ঘোড়া আর সাহাবকে ছিটকে নালায় ফেলে দিলো। সাহাব ধাক্কা খেয়ে নালার ধারের এক খড্ডায় (গর্তে) পড়ে গেলো। হাথিটা তাকে দেখতে পেলো না। ঘোড়াটা নালার মাঝে রক্ত মাখা গায়ে উঠে দাঁড়ালো তারপরই সেটা ছুটে নালার ওপার দিয়ে পালালো, হাথিটাও তার পিছে পিছে ছুটে গেলো।"

"আমরা গাছ থেকে নেমে দেখলাম সাহাব বেহোস (অজ্ঞান) হয়ে খড্ডায় পড়ে আছে। তাকে তুলে নিয়ে আমরা ছাউনিতে ফিরে এসে হাথিতে সওয়ার হোয়ে সেই দিনই ঘাস-বনৌলিতে চৌধরি বজরবণ্টু সিং-এর বাড়ি চলে গেলাম।"

মণ্টু বল্লে—"ক্যাপ্টেন সাহেবের রাইফল্‌টার কি হোলো ?"

গণেশ বল্লে—"ঘোড়াটার কি হোলো ?"

জমাদার বিরক্ত ভাবে বল্লে—"ধুত্তোরি ! তোমরা গপ্পো শুনবে তো শোন, রাইফোল্ কি হোলো, ঘোড়া কি হোলো সে খবরে কি দরকার ?"

লালু বল্লে—"ও সব দামী জিনিস কি না, তাই ওরা জানতে চায় ।"

"অরে দামী জিনিস আছে তো কি হোয়েছে ! রাইফোল্ ঘোড়া এ সব ত দু পাঁচ হাজার টাকার জিনিস, পল্টনে ও রকম জিনিসের জন্তে কেউ পরোয়া করে না ।" দারোয়ানজীর দু পাঁচ হাজার টাকার প্রতি এ রকম তাচ্ছিল্য দেখে কেউ আর কিছু বলতে সাহস করল না। জমাদার ফের বলতে লাগলো—"চৌধরি বজরবণ্টু সিং তো কাপ্তান সাহাবের খুব সেবা যত্ন খাত্তির করতে লেগে গেলো। সাহাবের পা ভেঙে গিয়েছিলো কিন্তু সে কথা সে ভাবছিলো না। সে কেবল বারে বারে চৌধরিজীর কাছে আফসোস (আক্ষেপ) করছিলো যে হাথিটা মরলো না। চৌধরি সব শুনে গম্ভীর হয়ে বল্লো—'হম্ তো বুঢ্‌ঢা হো গয়া, কাপ্তান সাহাব ! শিকার কা শওখ সব নহী হয়, মগর উয়ো হাথি আপকো জখম কিয়া, অওর উয়ো শয়তান গাঁওকা আদমীকা ভি বহুৎ খারাবী কিয়া, তব উসকো সাজা দেনা চাহিয়ে।' এই বলে সে তার আরদালীকে বল্লে 'বব্বর-খোর বন্দুক নিকালো।' তারপর আমাদের সামনে সেই বন্দুকটা আনা হোলো। প্রকাণ্ড লম্বা একটা কাঠের বাক্স, তার ভিতর একটা তামার চোঙা। চোঙার মুখ খুলে দুজন লোকে টেনে বন্দুকটা বার করলো। সেটার সমস্তটা কাপড় জড়ান আর কাপড় থেকে টপ্ টপ্ কোরে তেল পড়ছে।"

মণ্টু বল্লে—"কি, বন্দুকটা তেলে চুবিয়ে রেখেছিলো নাকি ?"

দারোয়ানজী বল্লে—"হ্যাঁ বন্দুকটাকে মাসে এক মন কোরে তেল খাওয়ান হোতো। তেল খেয়ে খেয়ে বন্দুকের জোর বাড়তো।"

মণ্টু বল্লে—"যাঃ, ইস্পাত লোহা আবার তেল খাবে কি ? তেল দেয় শুধু মরচে পড়া আটকাবার জন্তে।"

"হ্যাঁ, তুমি তো অনেক জানো ! ঘি খেলে যেমন মানুষের জোর বাড়ে, তেল খেলে তেমনি হাথিয়ারের (অস্ত্রের) জোর বাড়ে।"

মণ্টু কি বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় গণেশ বল্লে—"দাদা বাঁশে তো মরচে পড়ে না, তবে বাঁশের লাঠিতে তেল দেয় কেন ?"

এ কথা শুনে ঘণ্টু কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। জমাদার তাতে মহাখুশি হয়ে বল্লে—"শাবাস গণেশদাদা! ঠিক বলেছো যেয়ে বাবা, তুমি বড়ো হলে নিশ্চয় বালিস্টর (ব্যারিস্টার) হবে।" এই বলে সে বলতে লাগলো—"কাপড়া লত্তা খুলে, তেল মুছে বন্দুকটা যখন বার করলো, তখন সেটা দেখে, আমরা তো আমরা, কাপ্তান সাহাব, যে এত বড় লড়াইয়ে গোরা, সেও অবাক হোয়ে গেলো।"

"তার সারা বদনটায় সোনার কাজ করা ফওলাদ ইস্পাত ঝক্‌ঝক্ করছে, প্রায় তিন গজ লম্বা, আমার কব্জীর মত মোটা নল। সওয়া মন ওজন, সে ত বন্দুক নয় সে তোপ কি বাচ্চা!"

"পরদিন খুব ভোরে চৌধরি বজরবণ্টু সিং দশটা হাথি আর বিস্তর লোকজন নিয়ে চল্লো পাগলা হাথি শিকারে। কাপ্তানের হুকম পেয়ে একটা পণ্টনি রাইফোল্ নিয়ে আমিও সঙ্গে চল্লাম।"

"বিকালের দিকে আমরা আবার সেই নালাটার ধারে সেই বড়ো বড়ো পাথরগুলোর কাছে পৌঁছালাম। সেখানে জিনিসপত্র নামিয়ে হাথিগুলোকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। তারপর মুঠা মুঠা বিলাতি বারুদ আর ছোটখাট কামানের গোলার মত এক গুলি দিয়ে বব্বর-খোরের পেট ভর্তি করে ঠাসা হোলো। তারপর বন্দুক সাথে নিয়ে চৌধরিজী, যেখানে অনেক গুলো পাথর মিলে একটা উঁচু চবুতরার মত ছিলো, সেখানে উঠলো। সামনে একজন লোক তার কাঁধের ওপর বন্দুকের নলটা, তার পেছনে বন্দুক ধরে চৌধরি বজরবণ্টু সিং। চৌধরিজীর মোটা ভুঁড়ি পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এক জোয়ান, তাকে ধরে আর একজন, আর তার পেছনে আবার একজন, এই রকম করে তো তারা তৈয়ার হোলো। অন্যরা তো সবাই গাছে উঠলো। আমিও উঠলাম। তারপরেই চৌধরিজীর দল খুব হল্লা করে চেঁচাতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গাছের ওপর থেকে চিচকার কোরে হাথিটাকে গালি দিতে থাকলাম।"

"হঠাৎ জঙ্গলের ভিতরে ঝড় চলবার মত কড় কড় মড় মড় শব্দ আর তার সঙ্গে হাথির গর্জন শোনা গেলো। ক্রমেই আওয়াজ এগিয়ে এলো, দুড় দুড় শব্দ, জমিন কাঁপছে, গাছ পালা ভাঙছে, মধ্যে মধ্যে রেলের ইঞ্জিনের মত চিচকার, সে যেন ভুঁইডোলায় (ভূমিকম্পে) দুনিয়া খতম হচ্ছে। সবাই তো চুপ হয়ে গেলো, কেবল চৌধরিজী দয়োন আচারের সন্তান, সে মাঝে মাঝে জোরে হাঁক দিয়ে বলতে লাগলো—'চলে আও বদমাস্, চলে আও বেইমান কা বাচ্চা, ইধর আও শয়তান'।"

"দেখতে দেখতে, জঙ্গলের ধারের দু'তিনটা মোটা মোটা গাছ ঠিক দাতুইন (দাতন) কাঠির মত ভেঙে, প্রকাণ্ড কালো একটা দানোর মত সেই পাগলা হাথিটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে

দাঁড়ালো। সেটা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক খুঁজছে, এমন সময় চৌধরি তাকে জোরে হেঁকে বল্লে—'অবে, ইধর দেখ।' (ওরে, এদিকে দেখ্)। এই বলেই সে সঙ্গীদের বল্লে 'খবরদার'।"

"চৌধরি কথা বলতে বলতেই হাথিটা বন্ করে তার দিকে ফিরল। তারপর কানদুটো এগিয়ে, শুণ্ড্ তুলে ভীষণ চিচকার গর্জন কোরে, সেটা ভয়ানক জোরে হমলা (প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ) করলো, সে যেন একটা পাহাড় ক্ষেপে পঞ্জাব মেলের মত ছুটে আসছে। যখন সেটা দশ বার গজ মাত্র তফাতে আছে তখন সে একবার শুণ্ডটা নামালো। সেই মুহূর্তে চৌধরি বন্দুকের ঘোড়া টিপে তার কপালে তাক করে গুলি চালালো।"
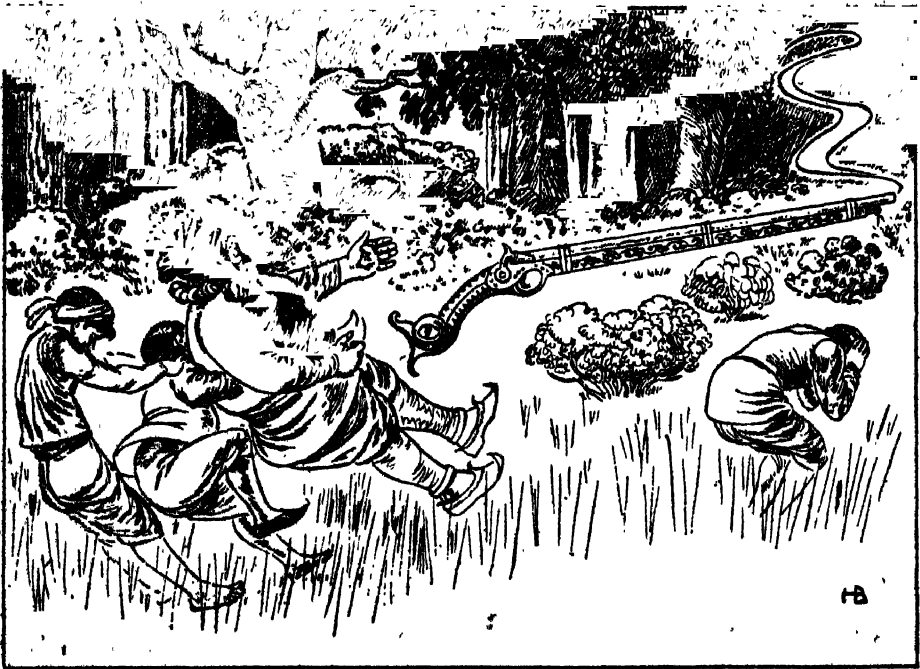
বজ্রবন্ট্ সিং আর তার তিন জোয়ান ছিটকে সেই নালার জলে ঝপাত করে পড়ে গেল।

"বাপ রে কি আওয়াজ! কি তেজ বব্বর-খোরের! কি জবরদস্ত হাথিয়ার! দ্দড় দ্দড় দুড়ুম করে বাজ পড়ার মত আওয়াজ হোলো আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রকাণ্ড ভারী পাগলা হাথিটা মাটিতে পড়ে, ঠিক আমাদের লালুদাদার খেলার মত, তিন ঘুমণ্ডি (ডিগবাজি) খেলো। বব্বর-খোরের নলটা ক্ষেপা ঘোড়ার মত লাফিয়ে আকাশে উঠলো আর তার কুঁদার লাথি লেগে অত বড় জোয়ান মরদ বজ্রবন্ট্ সিং আর তার তিন জোয়ান ছিটকে সেই নালার জলে ঝপাত

করে পড়ে গেলো। কেবল যে লোকটার কাঁধে নল ছিল, সে দুহাতে কান চেপে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলো।"

"হাথিটা তো দু-এক বার পা ছুঁড়ে ঠাণ্ডা হয়ে মরে গেলো। আমরা তখন নেমে এসে চৌধরিজী আর তার দলের লোকদের তুললাম। তারপর সেই বুনো হাথিটার পাঁচ পাঁচ হাত লম্বা আর আমার জাংঘের মত মোটা দুই দাঁত নিয়ে আমরা ঘাসবনৌলিতে ফিরে এলাম।"

"পরদিন আমরা যখন কাপ্তান সাহাবকে নিয়ে শহরে ডাক্তার দেখাতে রওয়ানা হবো, তখন চৌধরিজী সেই দাঁত দুটো কাপ্তান সাহাবকে সওগাত (উপহার) দিলো।"

"কাপ্তান সাহাবের ইচ্ছা ছিলো বন্দুকটাও নিতে। কিন্তু সে কথা চৌধরিকে বলতে সে বল্লো—'কাপ্তান সাহাব! ওটা দেওয়ার চেয়ে আমার অর্ধেক জমিদারী দেওয়া কম কথা। তবে আমি চৌধরি বজরবণ্ট্‌ সিং, তগা ব্রাহ্মণ। আমার বংশের রীতই হচ্ছে দান, তোমার যখন ওটা পসন্দ্‌ হয়েছে, তখন নিতে পারো। খালি আফসোস এই যে খাজা রওঘন জুস্‌ বেঁচে নেই যে আর একটা বব্বর-খোর বানাবে, আর লক্ষ্ণৌয়ের নওয়াবও নেই, যে তা হজার হজার অসরফি দিয়ে কিনবে'।"

"কাপ্তান সাহাব একথা শুনে চৌধরিজীর দুহাত চেপে ধরে বল্ল যে, সে এ কথা জানতো না তাই চেয়েছিলো। বব্বর-খোর যখন একটা বই দুটো হতে পারে না, আর চৌধরি বজরবণ্ট্‌ সিংও আর হবে না, তখনও দুইই এক জায়গায় থাকা উচিত।"

হকীমী চাল

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় যেমন নবরত্ন ছিল, বাদশাহ আকবরের দরবারেও সেই রকম নবরত্ন ছিল। তাদের মধ্যে গাইয়ে তানসেন, আইনজ্ঞ আবুলফজল, শাসনকর্তা টোডরমল, যোদ্ধা মানসিংহ এই রকম সব বড় বড় লোক ছিলেন। বাদশাহের দরবারে গুণী ও জ্ঞানী লোকের খুব খাতির ছিল বলে নানা দেশ থেকে আসল ও নকল নানারকম বিদ্বান লোক সেখানে আসতো।

একবার ঐরকমভাবে খোরাসান থেকে এক প্রসিদ্ধ হাকিম সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বল্লেন যে, পৃথিবীর যত রোগ তার সকলের চিকিৎসা তাঁর জানা আছে আর সেই মর্মে নজীরও তিনি দেখালেন অনেক। সে সব দেখেশুনে বাদশাহ তাঁকে খুব আদর যত্ন করে দরবারের হাকিম হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

হাকিম সাহেবের পেটে বিদ্যা ছিল কিনা তা আমাদের বিশেষ জানা নেই। হয়ত তিনি সত্যি-সত্যিই খুব বড় চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক যে বাদশাহ আকবরের শরীরটা ছিল খুব মজবুত আর তাঁর ধাতটাও ছিল খুব পোক্ত, কাজেই অসুখ-বিসুখ তাঁর বিশেষ হোতও না আর অল্প-স্বল্প কিছু হলেও তিনি বড় একটা সে-দিকে নজরও দিতেন না।

যাই হোক, ফলে হোলো এই যে, রোজ খাস্ দরবারে যখন সবাই নানা রকম আলোচনা কথাবার্তা বলতো, হাকিম সাহেব তখন চুপ করে বসে শুনতেন। কোন কথা বলবার অজুহাত

তাঁর জুটতো না, কাজেই কি আর করেন। বাদশাহ মাঝে-মাঝে তাঁর দিকে ফিরে তাকাতেন আবার চুপ করে। একটু মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, যেন তিনি হাকিম সাহেবের অক্ত-ভরত অবস্থা দেখে খুব আমোদ পাচ্ছেন।

দিন কতক যায়, রোজ এই ব্যাপার দেখে হাকিম সাহেব মনে-মনে ভয় পেতে লাগ্‌লেন। তাঁর মনে হোতে লাগ্‌লো বুঝিবা অন্ন যায়। এরকম বেকার হয়ে বসে থাক্‌লে বাদশাহ আর কদিনই বা খুশী থাকবেন।

কাজেই আর কোনও উপায় না দেখে তিনি বাদশাহের খাওয়া-শোওয়া ওঠা বসা এই সব দিন রাত তদারক করতে লেগে গেলেন। তাঁর বিধি ব্যবস্থার চোটে আকবর অস্থির হয়ে উঠলেন। কেননা ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুর্দশায় দিন কাটানোর দরুণ তাঁর থাকা খাওয়ার মধ্যে অনেক কিছু অভ্যাস ঢুকেছিল যেটা ঠিক নবাব বাদশাহদের চাল-চলনের রীতির মত ছিল না।

এটা করতে "জলনুস" বারণ করেছেন, ওটা খেলে "বুখ্‌রাটের" মতে অসুখ করে এই সব শুনতে-শুনতে যখন তিনি তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, তখন একদিন এক ঘটনা ঘট্‌লো।

আকবর কাঁচা পেঁয়াজের খুব ভক্ত ছিলেন। এমন কি মাঝে-মাঝে খাওয়ার মধ্যে আগে কাঁচা পেঁয়াজে কামড় মেরে, আশ-পাশের লোকের তাক্ লাগিয়ে দিতেন—কারণ এটা ঠিক রাজা উজীরের দস্তর ছিল না। একদিন সেইরকম পেঁয়াজে কামড় মেরে খেয়ে তার ঠিক পরেই তিনি জল খেতে যাচ্ছেন এমন সময় হাকিম সাহেব একেবারে হাঁ হাঁ কোরে এগিয়ে এসে বারণ করে বল্লেন –

"জাঁহাপনা গোস্তাকি মাফ্ করবেন কিন্তু বুখ্‌রাট বলে গেছেন কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েই জল খাওয়া যা, আর বিষ খাওয়াও তা।"

আকবরের ত চক্ষু স্থির। তিনি বল্লেন—"কই আমি ত প্রায়ই এরকম খেয়ে থাকি, কিছু ত কখনো হয় নি।"

হাকিম সাহেব বল্লেন—"জনাবকে পেঁয়াজ খাওয়ার ঠিক পরেই জল খেতে ত এর আগে দেখি-নি। আর যদিই বা এ-কাজ আগে করে থাকেন তা হলে, ঈশ্বরের দয়ায় আর রক্তের জোরে বেঁচে গেছেন। তবে, অপরাধ নেবেন না, সত্যি বলতে কি, হুজুরের বয়স ত বেড়েই যাচ্ছে, এখন আর মিছামিছি বিপদ ডেকে এনে কাজ কি ?"

আকবর মনে-মনে ভেবে দেখলেন। কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার ঠিক পরেই জল কখনো

খেয়েছিলেন কি না, সে কথা স্পষ্ট মনে পড়ল না। যাহোক সেবারকার মত তাঁর খাওয়াটা মাটী হোলো। বিরক্ত হয়ে তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন।

তার কিছুদিন পরে বাদশাহ শিকারে বেরিয়েছেন। একটা বড় হরিণের পেছনে ঘোড়া

একটা বড় হরিণের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে···পথ হারিয়ে বসলেন।

ছুটিয়ে তাড়া করে অনেকদূর গিয়ে তিনি সঙ্গীদের থেকে ছিটকে পড়ে পথ হারিয়ে বসলেন। জঙ্গলে অনেক ঘোরাঘুরি করার পর এক জায়গায় এক বুড়ো রাখাল বসে খাচ্ছিল তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাখালকে নিজের পরিচয় দিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে বলায় সে তটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া ফেলে উঠে ঝুঁকে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। আকবর তখন এক হেসে বল্লেন—"এত তাড়াতাড়ি নেই, তুমি তোমার খাওয়া শেষ করে নাও, আমার ঘোড়াটাও ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিক।"

বুড়ো রাখাল বাদশাহের অনুমতি পেয়ে ফের খেতে বসলো। খাবে আর কি, গোটাকতক

শুকনো রুটি, একটু নুন আর একটা বড় কাঁচা পেঁয়াজ। বাদশাহ ঘোড়া থেকে নেমে রাখালের খাওয়া দেখতে লাগলেন।

রুটি সবটা খাওয়া হয়ে যাবার পরে এক টুকরো পেঁয়াজ বাকী রইলো। বুড়ো সেটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে তার বদনা থেকে জল খেতে যাবে, এমন সময় বাদশাহ তাড়াতাড়ি তাকে জল খেতে বারণ করলেন। রাখাল অবাক হয়ে কারণ জিগেস করায় তিনি বল্লেন—"আমার হাকিম সাহেব বলেন বুথ্‌রাটের মতে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে জল খাওয়াও যা আর বিষ খাওয়াও তা। আমার শরীর তোমার চেয়ে ঢের ভাল আর বয়সেও আমি ঢের ছোট, আমাকেই ওরা বারণ করে, তা তুমি তো বুড়ো লোক, তোমাকে আমি জেনেশুনে কি করে বিষ খেতে দিই বলো?"

রাখাল হেসে বল্লো—"এও কি কখন হয় খোদাবন্দ? আমি ত রোজ খাওয়া শেষ করি কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে, আর তার পরেই জলও খাই, কই বিষের কাজ ত কিছু টের পাই না।"

বাদশাহ একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—"সত্যি? কই জল খাওতো দেখি কিছু হয় কি না?"

রাখাল তখুনি ঢক্‌ঢক্ করে এক বদনা জল খেয়ে, গা ঝেড়ে উঠে বল্লো—"জাহাপনা, আজ্ঞা হয় ত এবার আপনাকে পথটা দেখিয়ে নিয়ে যাই।"

আকবর কোন কথা না বলে ঘোড়ায় উঠে সেই বুড়ো রাখালের সঙ্গে-সঙ্গে চল্লেন। অনেকদূর যাবার পর একদল ঘোড়-সওয়ারের সঙ্গে দেখা হলো, তারা বাদ্‌শাহেরই খোঁজে বেরিয়েছিল।

আকবর বাদশাহ তাদের হুকুম দিলেন—"এই বুড়ো রাখালের বাড়িতে খবর দাও যে, ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আর ওকে খুব সাবধানে রাখ, আমার বিশেষ দরকার আছে।"

সেদিনের দরবারে বাদশাহ হাকিম সাহেবকে ডেকে বল্লেন—"এই বুড়ো আজ আমার সামনে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েই জল খেয়েছে। ও বলে যে, ও রোজ রোজ তাই করে। ওকে আমি আমার কাছেই রাখছি। ও রোজ কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে জল খাবে। দেখি ওরই বা কি হয় আর আপনার কথারই বা কি দাম।"

তারপর দিন যায় আর হাকিম সাহেবের আত্মাপুরুষ ক্রমে শুকিয়ে কাঠ হয়। বুড়োর শরীর খারাপ হওয়া ত দূরের কথা, দিব্যি খানা-পিনা কোরে, তোয়াজে থেকে, তার ত শরীরটা দিনের দিন যেন ভালই হোতে থাকলো। রোজ তার খাবার শেষে বাদশাহ হাকিম সাহেবকে

দাঁড় করিয়ে তাকে কাঁচা পেঁয়াজ আর জল খাওয়ান আর হাকিম সাহেবকে জিগ্যেস করেন—"কি হাকিম সাহেব, বিষের কাজের লক্ষণ কিছু দেখছেন ?"

হাকিম সাহেব আর কি বলবেন, শুধু মাথা নেড়ে, মুখ নীচু করে না জানান।

শেষে একদিন বাদশাহ বল্লেন—"কাল আমি ঐ রাখালকে বিদায় দেবো। হাকিম সাহেব, আপনি দরবারের সকলের সামনে ওকে পরীক্ষা করে, এত বিষ খেয়ে ওর কি হয়েছে সেকথা সকলকে বুঝিয়ে দেবেন। আর বিষ খাওয়ার ফল যদি কিছু না দেখাতে পারেন, তাহলে আমাকে মিথ্যা ভয় দেখানোর উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে তৎক্ষণাৎ দেওয়া হবে।"

একথা শুনে হাকিম সাহেবের তো প্রাণ উড়ে যাবার গতিক হোলো। তিনি কোন মতে সে রাত্রে সেই রাখালের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বল্লেন। রাখাল সব শুনে হেসে বল্লো—"আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি এর বিহিত করবো।"

পরদিন দরবারে সকলের সামনে হাকিম সাহেব, আর অন্য দু-চারজন হাকিম মিলে রাখালকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষায় কাঁচা পেঁয়াজ আর জল খেয়ে যে তার শরীরের কোনও ক্ষতি হয়েছে তা দেখা গেল না।

বাদশাহ পরীক্ষার ফল শুনে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"তাহলে হাকিম সাহেবের কথা মিথ্যা। বাদশাহকে যে মিথ্যা ভয় দেখায় তার উপযুক্ত সাজা কি ?"

সবাই চুপ নিস্তব্ধ। হাকিম তো ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় সেই বুড়ো রাখাল হাত জোড় করে বল্লে—"খোদাবন্দ, হুকুম হয় ত এ বান্দা একটা কথা বলে।"

বাদশাহ অনুমতি দিতে সে বল্লে,—"হুজুর হাকিম সাহেব আপনার হাকিম। বুখ্‌রাটও ছিলেন নবাব বাদশাহের হাকিম। কাজেই এঁরা আপনাদের ধাত যে রকম সেই রকম ব্যবস্থা দিয়েছেন। আর আপনার যদি বিশ্বাস যে আপনার ও আমার ধাত একই রকম, তাহলে এই পাঁচনগাছটা নিয়ে দিন কতক আমার মত রোদে রোদে মাঠে গরু ভেড়া চরিয়ে দেখুন আপনার শরীরে সেটা কেমন সয়।"

বাদশাহ একটু ভেবে বল্লেন—"হাঁ এ কথা ঠিক।"

হাকিম এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলেন। আর সে রাখাল বুড়ো, বাদশাহের কাছে বকশিশ ত পেলোই, হাকিম সাহেব যে তাকে কি খাতির যত্নই করলেন তা বলতে গেলে তার একটা গল্প ফাঁদতে হয়।

শীতের পর বসন্ত, বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের অগ্রদূত আসার কিছু সাড়া পড়েছে, দখিনে বাতাসে চৈতাই দোলার আরম্ভ দেখা দিয়েছে। সকালের রোদ মিঠেকড়া, তাতে মণ্টুদের বাড়ির সামনের আমগাছে কচি আমে অম্লমধুর স্বাদও এনেছে। আর সেই সঙ্গেই এসেছে পাড়ার যত ডানপিটে আম-চোর ছোঁড়ার উৎপাত। তবে মণ্টু মাস্টারের দল যথেষ্ট সজাগ এবং সমর্থ, কাজেই ইটের বদলে পাটকেল সমানে চলে, মাঝে মাঝে তাই থেকে ছোটোখাটো দাঙ্গারও শুরু হয় যাতে বড়দের এসে থামাতে হয়, অনেক হৈ-হল্লা করে, চাঁটি চাপাটি চালিয়ে।

আজকের রবিবারের সকালটাও ঐ রকম এক হল্লায় পড়ে গরম হয়ে উঠেছে। বারান্দার মজলিস ভেঙে যাবার উপক্রম প্রায়। তবে হাতাহাতি বা মাথা ফাটাফাটি হয়নি, চলেছে চেঁচামেচি ও কথা-কাটাকাটির উপর দিয়েই। এই হাঙ্গামার বিষয়বস্তু আম নয় টীম, অর্থাৎ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে গোল খাওয়া নিয়ে। বড়দের দলেই তর্কের আরম্ভ, কিন্তু এখন ছোট-বড় সবাই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে ; শুধু এক জমাদার এতো উষ্মার কারণ কিছু ঠাওর না করতে পেরে, চুপ করে চতুর্দিকে দেখছে আর জোর খইনি ডলে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা হোলো রাশিয়ান টীমের গোল দেওয়ার বহর নিয়ে। আগেই বলেছি মণ্টুদের বারান্দার বৈঠকে রাজা-উজির মারার থেকে আরম্ভ করে, হাডুডু খেলা পর্যন্ত সবকিছু নিয়েই গল্পগুজব ও তর্ক চলে। ঐভাবে সারা শীত কেটেছে পাকিস্তানের টেস্ট নিয়ে। তারপর দু'দিন একটু ঠাণ্ডা ছিল আসর, আবার হোলীর উৎসবের সঙ্গে এলো রাশিয়ান ফুটবল খেলোয়াড়ের

দল। সেখানেই খেলে দমাদ্দম গোল দেয় আবার তার উপর বোম্বাইয়ে তো তাদের ক্যাপ্টেনকে নিয়ে হুলস্থুল ব্যাপার। মজলিসে তর্কের তুফান আরম্ভ হয়ে গেল, আজ তার চূড়ান্ত।

বড়দা বলছিল, "ঠিক বোঝা গেলনা ব্যাপারটা, যেখানেই খেলে তিন গোল। ভাল টীম, মন্দ টীম, মাঝামাঝি টীম, সকলকেই তিন গোল, এ যেন নেমন্তন্নের বরাদ্দ রসগোল্লা। ওদের খেলার বোধ হয় কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এতটা সময়ে এতগুলো গোল,—কমও নয় বেশীও নয়। ওদের তো সব কিছুই প্ল্যান করা, টাইম মাপা, যেমন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান।"

ভুলুবাবু বল্লে, "আরে দূর, তোর যেমন কথা! খেলছে বেলে খেলা, ছোটদের ছেলে ভুলানো। হুকুম এসেছে, 'জিতবে কিন্তু বেশী গোল দেবেনা। দিলে ইণ্ডিয়ানরা মনে দুঃখ পাবে। ইণ্ডিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই।' তাই পুরো একগণ্ডা না করে পৌনে গণ্ডা গোল দেবে।"

বড়দা বল্লে, "তুই বলতে চাস ওরা ইচ্ছে করলে ঐ সময়ে আরো বেশী গোল দিতে পারতো?"

ভুলু বিজ্ঞের মত একটু মুচকি হেসে বল্লে, "আচ্ছা ভাই নরেশবাবু, তুমিই বলতো—ও নিজেই বল্লে ভাল-মন্দ সব টীমকেই তিন গোল দিচ্ছে ইচ্ছেমত—"

বড়দা একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, "আমি বলিনি ইচ্ছেমত। ইচ্ছেমত আবার কি? তুইকি বলতে চাস যে ওরা যত ইচ্ছে, যাকে ইচ্ছে, পাঁচ সাত দশটা গোল দিতে পারে?"

"হ্যাঁ, আমি তাই বলছি। দেখেছিনা তোদের খেলার বহর? পাঁচ-সাতটা গোল, পনেরো বিশটে গোল, ওরা দিতে পারে তোদের যে কোনো টীমকে, তোর মোহনবাগানকেও।"

"হ্-বাঃ, এ তোর ইস্টবেঙ্গল নয়—"

"ঢের ঢের দেখেছি তোর মোহনবাগান।" এই বলেই ভুলু মোড় ফিরিয়ে বলে বসলো, "তা ইস্টবেঙ্গলকেও পনেরো-বিশ না হোক আট-দশটা গোল ওরা দিতে পারত।"

হীরেনবাবু তাতে টিপ্পনী কাটলেন, "এ যে তাজ্জব ব্যাপার ভুলুবাবু। টেস্ট-ম্যাচে যখন আমাদের ম্যাড়াকান্তরা ভড়কে গিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচ নষ্ট করছিলো তখন তো আপনি পিচের দোষ, আম্পায়ারের বেইমানী, ক্রাউডের মস্তামী, এই রকম কতকিছুর ওজুহাতে ওদের সাফাই গাইছিলেন। আর আজ আপনার সাধের ইস্টবেঙ্গলকেও ভাসিয়ে দিয়ে রাশিয়ানদের জয়গান! পার্টিতে নাম লিখিয়েছেন নাকি?"

বড়দা উৎসাহের সঙ্গে বল্লে, "ঠিক ধরেছেন হীরেনবাবু, এইতো সেবার যখন সোভিয়েটের দলকে গো-হারান হারালে হাঙ্গেরিয়ানরা, কি রাগ কি দুঃখু ওর—"

"বাজে ক্যাচ-ক্যাচ করিসনে বলছি। 'শো-হ্যায়ান কবে হারলো অল্ লেভিয়েট কল?"

"অ্যাঁহ্! অবাক্ করলি ভুলু। ওরা খায়নি ড্যাম ডিফিট?"

"কথ্খনো খায়নি।"

"আলবাত খেয়েছে। হাজেরীর কাছে, যুগোশ্লাভের কাছে, সুইডেনের কাছে—"

ভুলুবাবু রাগ চেপে গম্ভীর মুখে "পাগলে কি না কয়—" বলে উদাসভাবে বাইরের দিকে মুখ ফেরালো। তর্ক-বিতর্কের ঝাঁঝটা যেন কিছু কমে এলো। ছোটরা এতক্ষণ উৎসুক হয়ে মজা দেখছিল, পালা সাঙ্গ হয়ে এলো দেখে তাদেরই মধ্যে কে একজন জকার দিয়ে উঠলো—

"ঝাড় অণ্ডে কি জয়—"

হাসির রোল উঠলো। আর সেই সঙ্গেই ভুলুবাবু চাপা রাগে যেন বোমার মত ফেটে পড়ে বল্লে, "কে রে হতভাগা ননসেন্স? যত সব গবেট অনড্বান এসে জুটেছে এখানে—"

ব্যাস্! লেগে গেল ফৈজত।

"কে অনড্বান? তুই নিজে কি?"

"চুপ কর বেকুব কোথাকার—"

"তুই চুপ কর!"

"শাট্ আপ্, ইউ ফুল—" হল্লার চোটে মজলিস্ তোলপাড়। জমাদার রামগিদ্ধড় সিং তো ভ্যাবাচাকা লেগে, খইনিসুদ্ধু বিষম খেয়ে, কেশে, থামাবে কি করে ভাবছে, এমন সময় গম্ভীর গলায় শোনা গেল, "ছোটকর্ত্তা আছেন নাকি? ডাকের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন মৌলানা সাহেব; বিশাল দেহ, ঘন লম্বা সাদা দাড়ি, মাথায় উচু সাদা পাকান সুতার শক্ত ইস্ত্রী করা মেটেবুরুজী গোল টুপি, পরনে গরম কাপড়ের কালো লম্বা শেরবানী ও পাজামা।

মৌলানা সৈয়দ ইরফান আলি সাহেবের সঙ্গে এ-বাড়ির চেনাশোনা ও বিশেষ খাতির বহু দিনের। তাঁর আসার শব্দেই সব গোলমাল থেমে গেল। বাড়ির বড় ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, "আজ্ঞে, ছোট-কা' তো বেরিয়েছেন সকালেই—"

"কখন ফিরবেন কিছু জানা আছে?"

জমাদার উত্তর দিলে, "অভি আতেহি হোঙ্গে। আপ্ দফতর মে তস্‌রীফ রখিয়ে—"

মৌলানা সাহেব ভিতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "যদি আপনাদের অসুবিধে না হয় তো এখানেই বসি। এখনো শীতের আমেজ রয়েছে, আপনাদের এই দক্ষিণমুখো বারান্দায় আলোবাতাস রয়েছে—"

হকীম হড়ুকবাজ

"এখানেই বস্থন, বেশ তো।" বলে চেয়ার এগিয়ে দিলে ভুলু। মৌলানা সাহেব ধন্যবাদ দিয়ে বসলেন।

তারপর সবই চুপচাপ, শুধু যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। কিসের যেন একটা অস্বস্তি মৌলানা সাহেব থেকে ছড়িয়ে সমস্ত আসর জুড়ে বস্‌ছে। তিনি তো একেবারে চুপ, কেবল মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট শব্দ করছেন মুখে আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর সেই ঘন সাদা দাড়িতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সবাই তো অবাক, তাঁর হোলো কি?

মৌলানা সাহেবের মুখ তাদের সকলেরই চেনা। তাতে একটা গভীর প্রশান্ত গম্ভীর ভাবই দেখা যেত সর্বদাই। এমন কি দাঙ্গার সময় যখন হিন্দু-মুসলমান দুই দলই তাঁকে খুন করতে গিয়েছিল এবং এ-বাড়ির কর্তারা অনেক চেষ্টায় তাঁকে সপরিবারে উদ্ধার করে আনে, তখনও শুধু একবার খোদার কাছে আক্ষেপ জানিয়ে তিনি আবার ধৈর্য ধরেন। আজ সেই লোকই কেমন যেন বিচলিত চিন্তিত।

মোটরের শব্দ এলো তারপর এলো, ছোটকর্তার গলার আওয়াজ—"আরে মৌলানা সাহেব যে, এত সকালে কি খবর?" বল্‌তে বল্‌তে তিনি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলেন।

"খবর আছে। একটু সল্লা-পরামর্শ বড়ই দরকার—"

ছোটকর্তা মৌলানা সাহেবের গলার স্বরে একটু কাতর ভাব শুনে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বল্লেন, আস্থন আমার অফিস ঘরে—"

প্রধান দু'জন তো বসবার ঘর দিয়ে ছোটকর্তার অফিস ঘরে পর্দা ঠেলে ঢুকলেন। এদিকে নবীনের ও চ্যাংড়ার দল এ ওর মুখ চাওয়া-চাউই করতে লাগল। ভুলুবাবু থাকৃতে না পেরে সট্ করে, বসবার ঘরের ছায়ার আড়ালে, পা-টিপে অফিস ঘরের পর্দার পাশে কান খাড়া করে দাঁড়াল। বারান্দায় একটা চঞ্চল হাওয়া যেন খেলে গেলো, গুণগুণ মৃদু আওয়াজ চল্‌লো চারিদিকে। কিছুক্ষণ পরে আবার কথাবার্তা চল্‌লো, তবে অনেক ধীরে।

মিনিট কুড়ি পরে ভুলু সট্ করে বেরিয়ে এলো। সবাই উৎসুক হয়ে তার দিকে ফিরতে সে মুখে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করতে বল্লে। সেই সঙ্গে শোনা গেলো দুই প্রধান লোকের ভারী গলার আওয়াজ।

ছোটকর্তা বল্‌তে বল্‌তে বেরোলেন, "তা মৌলানা সাহেব, আমাদের তো প্রবাদ আছে 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' কিন্তু আপনাদের জানানা মহল তো শুনেছি সেদিকে অনেক বেশী সংযত—"

মৌলানা সাহেব একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লেন, "সে সব দিন কি আর আছে, এ তো

স্বাধীন জানানায় জমানা! আর আপনি তো জানেনই যে আমি ওসবের সাতে-পাঁচে থাকিনা—"

ছোটকর্তা কি একটা বল্‌তে গিয়ে ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। তারপর একটু গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "আচ্ছা দেখি কি হয়। বোধ হয় অত কিছু হবে না—আপনি অত বিচলিত হবেন না। হয়ত সহজেই মিটে যাবে।"

মৌলানা সাহেব গম্ভীর ভাবে তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, "ইন্‌সা আল্লাহ! খোদা জানেন কি হবে।" তারপর একটু থেমে, "আদাব তা'হলে আসি"—বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ছোটকর্তা একটু অন্যমনস্ক ভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে আবার মোটরে গিয়ে চেপে বস্‌লেন। ড্রাইভারকে হুকুম দিতেই গাড়ি বেরিয়ে গেলো। বারান্দার দল হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল।

ভুলুবাবু তাকিয়ে রইলো গাড়ির দিকে। মোটর যখন ফটক ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলো তখন সে হঠাৎ ঘুরে একটা থিয়েটারী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, উপর দিকে চোখ তুলে বল্লে, "ছোটকর্তা, এ গরীবেরে তো সাব্‌সে!" বলেই হা হা করে হাসতে লাগলো। সকলে তার দিকে ততক্ষণে ঝুঁকে পড়ে তখন জিগ্যেস করছে সে কি শুনেছে। সে আবার গম্ভীর মুখ করে বল্লে, "আরে রও, অত চুলবুল কর কেন—" এই বলে বড়দার টিন থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে হাঁক দিলো, "এই এক কাপ গরম চা—" বড়দার তখন ধৈর্য শেষ, সে বল্লে, "ধুত্তোর চা; বলনা কি শুনলি, মৌলানা সাহেবের কি হয়েছে?"

"মৌলানা সাহেবেরই তো সাব্‌সে।"

"আঃ! কি যে, হেঁয়ালি তোর এতোও ভাল লাগে।"

"হেঁয়ালি আবার কি? ছৈয়দ ছায়েবের বিবি ধায় ফাডকে, আর তুই বলিস হেঁয়ালি!"

এই বলতেই তো সোরগোল পড়ে গেল। কেউ বলে, "অ্যাঁ বলিস কি?" কেউ বলে, "সত্যি নাকি!" কিন্তু ভুলু কেবল বলে, "চা লাও"। শেষে গণেশ ছুটে এক পেয়ালা চা নিয়ে এলো, তার পিছনে বড় ট্রেতে আরো কয় পেয়ালা চা নিয়ে এলো, বেয়ারা। সবাই চা নিয়ে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল ভুলুর দিকে। কোথায় গেল রাশিয়ান টীমের ফুটবল খেলা। সে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চায়ে এক লম্বা চুমুক দিয়ে মুখ তুলে বল্লে—

"আ-আ-আঃ! শোন তবে বলি।"

"মৌলানা সাহেবের বেগম সাহেবা, ঐ যে দাঙ্গার সময় লম্বা বোরকা পরা বিবি সাহেবা

রেখেছিলি ? হ্যাঁ, তারই ভাইয়ের ছোট মেয়ের সাদী খুব ধুম করে হবে। দাওত মঞ্জুর করাতে এল বেগম সাহেবার ভাতিজা, সে আবার মৌলানা সাহেবের ভাইয়ের জামাই।"

"তা নেমন্তন্ন পেয়ে তো সকলেই খুশী। গোল বাধল তার আনুষঙ্গিকে। আনুষঙ্গিক আবার কি ? সেটা হোলো তেল-সাবান-কাপড় সেন্ট ইত্যাদি, বিশেষ শাড়ি আর সরষের তেলে।"

"মৌলানা সাহেব ছুটাছুটি করলেন কয়দিন যদি পারমিট যোগাড় হয়। সেথানে কিছু হবার নয় দেখে বল্লেন, 'দু'চারখানা ভাল শাড়ি কাপড় নিজেদের বলে নিয়ে চল, অন্য কিছু করতে আমি নাচার।' সে কথা পছন্দ হোলো না বেগম সাহেবার, কেননা তাঁর ভাইয়ের বাড়ি এই শেষ মেয়ের বিয়ে। কাজেই উপায় রইল শুধু লুকিয়ে পগার পার করার। তাতে মৌলানা সাহেব বাধা দিলেন সাধ্যমত, শেষে বকাবকিতে অস্থির হয়ে বল্লেন যে, টাকা যা লাগে তিনি দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি এসবের মধ্যে থাকবেনও না এবং ওদের সঙ্গে যাবেনও না। শেষে রফা হোলো তাতেই।"

"রওনা সব হোলো। ভিসা ইত্যাদিও হোলো। তারপর মালপত্র স্পেশাল প্যাকিং করে, রওয়ানা দিলেন বেগম সাহেবা, তাঁর ভাতিজা এবং আরও জনা তিনচার। স্পেশাল প্যাকিং কি তা জানিস্ না ? আরে গর্দভ এমনি বাক্স পেটরায় ভরে নিলে তো বাণপুর দর্শনায় বিনা পারমিটের মাল কাস্টমস্ ধরে বাজেয়াপ্ত করবে। তাই শাড়ি কাপড় জড়ান হোলো যাত্রীদের গায়ে, আর তারই পাটের মধ্যে রইল তেল সেন্ট ইত্যাদি। সরষের তেলের চারটে পাঁচ-পোয়া বোতল নিলেন ভাতিজা সাহেব, চারখানা শাড়ি আর দু'খান মলমলের পাটের মধ্যে। তাঁর গতরখানি এম্নিতেই ছিল লম্বায়-চওড়ায় প্রমাণ সাইজের উপর। ঐ সব স্পেশাল প্যাকিং-এর পর চেহারা দাঁড়ালো কুম্ভকর্ণের মত।"

বড়দা বল্লে, "ধাঃ! তুই তো দেখিস্ নি নিজে'তবে এতো রং ফলাচ্ছিস কিসে ?"

"আরে মৌলানা সাহেব নিজেই বল্লেন ছোটকা'কে, 'আমি আগেই বলেছিলাম আমার ভাইজানকে যে ওর গতর যেমন মোটা ওর বুদ্ধিও সেইমত, আর চেহারার লম্বা বহরের সঙ্গে আক্কেলের মোটেই সামঞ্জস্য নেই'।"

"যাহোক, যাত্রা শুরু হোলো শিয়ালদহে সোজা ভাবেই, যদিও গাড়িতে উঠ্তে একটু বেশ রকমারি মুশকিল হোলো সবারই। একে তো মুসাফিরে গাড়ি প্যাক করে ভর্তি, তার উপর নিজেদের স্পেশাল প্যাকিং! বিপদ ঘটল বাণপুরের সীমানার স্টেশনে।"

"সেখানেই যত টিকিট রে, পাসপোর্ট রে, পারমিট রে। আর খোঁজ-তল্লাশী তো আছেই সেই সঙ্গে। সে একবার এ-গাড়ি, আবার ও-গাড়ি, আবার লম্বা প্ল্যাটফর্মের এম্পার ওস্পার। সেই টানা-পোড়েনে সকলেরই প্রাণান্ত।"

"ঐ রকম ঘণ্টা দুই চলবার পর ভাতিজা সাহেবের হোলো আর এক উৎপাত। অনেক সকালে গাড়ি ধরা দরকার বলে তার বুয়া আগের রাত্রে ভাতিজার খাওয়াটা একটু বেশ পরিপাটি করিয়েছিল।" সেই যে গানে আছে—

"শোল মাছেরি ঝোল বেঁধেছে মোরগেরি গোস
নানান্ পদে নাস্তা করি মেজাজ হোলো খোস্।"

"তাই মেজাজটা খোশই ছিল। তারপর সকালে সকলের খেয়াল হোলো লম্বা পথ। গোয়ালন্দ পৌঁছতেই রাত এগারটা, তা বাড়ির জামাই মানুষ কিছু ভালমন্দ না খেয়ে গেলে চলবে কেন। তাই রাত থাকতে উঠে আর এক চোট খাওয়া।"

"এখন এই বাণপুরে ছুটাছুটির ফলে রাতের শোল মোরগ ফজিরের আণ্ডা রুটির সঙ্গে লেগে গেল লড়তে। ফলে—

বড়দা একটু রুচিবাগীশ। সে বল্লে, "নে, নেঃ থাম। তোর সব কিছুতেই ঐ সব কেমন—"

"তবে তুইই বল—" বলে ভুলু আবার চা'য়ে মনোযোগ দিলে। সকলে বল্লে, "হাঁ হাঁ বলন। তারপর কি ?"

ভুলু একটু থেমে বল্লে, "আমি খোলামেলা সোজাকথাই বল্‌তে জানি, অতশত ভাষার চাপা-চুপি জানিনা।" পরেশবাবু বল্লেন, "বেশ তো! তাই বলুন না সোজা কথায়—"

"সোজা কথায় ভাতিজা সাহেবের তখন এমন এক অবস্থা দাঁড়ালো যে বহাল তবিয়তে ভদ্রস্থ রক্ষা করতে হলে তখুনি প্রয়োজন ভেতর বাইরের চাপ কায়দায় আনা। কেমন, হোলো তো ভাষা ঠিক ?"

সবাই হেসে উঠল। ভুলুবাবু বল্‌তে লাগলেন, "এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময়ও এগিয়ে এসেছে। তিনি ছুটলেন ব্যবস্থা কর্‌তে প্ল্যাটফরমের ওই শেষে। এখন ভিতরে চাপ, বাইরে বাঁধন, মোটা লোক তায় তেল কাপড়ের ওজন। স্টেশনে লোক গিজগিজ করছে, তাই ঠেলে, পাশ কাটিয়ে তিনি ছুটে চল্‌তে গিয়ে দিলেন পা এক কলার ছোবড়ায়। ব্যস্! পা হড়্‌কে, দুই গোঁত্তা খেয়ে, একেবারে—"

ছুটে চলতে গিয়ে দিলেন পা এক কলার ছোবড়ায়।

"লে হালুয়া"—বলে বস্‌ল গণেশ। হাসির রোল উঠল। বড়দা একটু সামলে গণেশকে দিল বকুনি।

হাসাহাসি থামলে ভুলু আবার আরম্ভ কল্লে, "ওই গোঁত্তা খেয়ে আছাড়ের ফলে সেই সরষের তেলের চারটে বোতল হোলো চুর। আর সেই চার বোতলের তেল পাঁচ পুরু কাপড়ের ফের ছাপিয়ে বাণপুরের প্লাটফর্মে দিলে বান ডাকিয়ে।"

"তারপর যা হবার তা হোলো। ধরপাকড়, তল্লাশী, থানা, জামীন জমানত!" বলে ভুলু চুপ করলে।

হীরেনবাবুর কবির মন ভিজলো। তিনি বল্লেন, "আহা বেচারা বেগম সাহেবা! ভাইঝির বিয়েতে আনন্দ করার জন্যই তো ওসব যাচ্ছিল"—

বড়দা বল্লে, "আরে থামুন মশাই। ঐ রকম বেআক্কেলে কাজের ফলে এখন কি আনন্দই

তিনি পাচ্ছেন নিজে আর কি আনন্দই দিচ্ছেন মৌলানা সাহেবকে। বেচারা যদি কেউ হয়তো সে আমাদের মৌলানা সাহেব। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই; ধর্ম-কর্ম সাহিত্য নিয়েই থাকে এখন, দেখুনতো কি হয়"—

ভুলু বল্লে, "কি আর হবে। তোর ছোটকা এম. এল. এ. লোক, উকীল, আর পার্টিতেও ওঁর ওজন বেশ আছে। তিনি বল্লেন, ও একটা জরিমানার উপর দিয়েই যাবে। আদালতে টানাপোড়েন কিছু হবে না, ম্যাজিস্ট্রেটের খাস ঘরেই সব হয়ে যাবে। অবিশ্যি আদালতে যাওয়াই বেইজ্জতি আর জরিমানা তো আছেই"—

"তবে? দেখুনতো ব্যাপারটা। ভদ্রলোক গুণী লোক, তার মান সম্ভ্রম সব চুলোয় গেলো এক নির্বোধ গোঁয়ার আর এক জেদী স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ে। আহা, নিরীহ বেকসুর মৌলানা সাহেবের কি দুর্গতি; সাধে কি বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী?" বলে বড়দা দু'হাত তুলে চারিদিকে চাইল, সবাই সায় দেয় যাতে।

জমাদারজী এতক্ষণ চুপ করে খইনি ডলছিল আর খুব মন দিয়ে শুনছিল সব বৃত্তান্ত। বড়দার কথা শেষ হতে না হতেই সে খইনিতে দুই জোরে চাপড় দিয়ে, সেটা মুখে ঢেলে, খুব মাথা নেড়ে বল্লে, "আঁ হাঁঃ। বিলকুল ঠিক হোইয়েসে"—

তা শুনে তো সবাই চুপ। মণ্টু তার মিহিগলায় জিগ্যেস কল্লে—

"কি বিলকুল ঠিক হোলো জমাদার?" তার উত্তর হোলো, "ওহি মওলানা সাহবের বেইজ্জতি আর তার বেগমের সজা।"

"অ্যা? বেকসুর লোকের সাজা, তাও বিলকুল ঠিক?"

"আলবৎ ঠিক্! যে লোক নিজের বিবি অওর এক শালার বেটাকে সম্‌হালতে জানেনা তারতো বেইজ্জতি হোবেই হোবে। সে শালার বেটা তো গঁওয়ার আর বেগম তো মূরখ্ নারী, ও তো এলেমদার মওলানা? ওকি জানেনা যে—

"ঢোল, গঁওয়ার, পশু, সুত নারী
ইয়ে সব্ তাড়নাকি অধিকারী।"

প্রবাদ বচন শুনে সবাই তো ফ্ল্যাট! তারপর ভুলুবাবু চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, "আরে বাপ্‌রে, দরোয়ানজী, সামলে কথা বলো। যা বলেছ বলেছ, ওকথা যেন বাইরে না যায়। গেলে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অমৃত কউর, রেণুকা রায়, মায় সমস্ত নারী প্রগতিও ফৌজ, ঝাঁটা-

খোন্তা, কাটারি-বঁটি নিয়ে, তোমায় আর আস্ত রাখবে না। আরে দাদারে, কি বচন?"—সবাই হাস্‌তে আরম্ভ কল্ল।

হীরেনবাবু বল্লেন—"তা ভুলুবাবু জমাদারজীর দোষ ধর্‌লে চলবে কেন? এই যে এতো প্রগতি আপনাদের ইংলিস্ স্পিকিং পাশ্চাত্ত্য দলের, তাদেরও তো বচন আছে—

"A Dog and a Woman and a Walnut Tree
The more you beat them, better they be."

শুনে তো সবাই অবাক্। জমাদার খুব মাথা নেড়ে বল্লে—"ওসব ইংলিস্-মিংলিস্ আমি জানিনা। অংরেজ লোক ম্লেছ্, নাইতে-ধুইতে জানেনা, ওদের সবকিছুই উল্টা, সবকিছুই অশুধ্। ও তো দেশী লোক, হিন্দুস্থানের মানুষ? নিজের বিবিকে কাবু রাখবেনা, শালার বেটাকে টিট্ করবেনা তবে কিসের ও মওলানা মওলভী ফাজিল্?"

গণেশ একটু রাগ করেই বল্লে—"দেখ জমাদার, ভাল হবে না যদি মৌলানা সাহেবকে ফাজিল ফক্কড় বল। ছোটকা'র বন্ধু লোক উনি, শুন্‌লে ছোটকা আস্ত রাখবেনা।"

জমাদার এখনকার কর্তাদের বাপের আমলেব লোক, সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"ওয়াহ্! ছোটোবাবু কি কর্‌বে? সে তো আমার সামনে বড়ো হোলো মোছ বেরোলো, সে আবাব বুঝে কি, যে"—নরেশবাবু ব্যাপারটা গোলমেলে দাঁড়াচ্ছে দেখে মাঝে পড়ে সবাইকে বোঝালেন যে, মৌলভী ফাজিল মানে মহাপণ্ডিত, বাংলাভাষাব গুণে পণ্ডিতও ছেবলা হয়ে যায়।

জমাদার একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিজের মনে বল্‌তে লাগলো: "অবে জমানা তো খরাব হোগয়া। দিনকাল সবহি খরাব। হোতো আগেকার দিন তো বেগমের বিগড়ান আক্কেলের দওয়া মিলে যেতো"—

নরেশবাবু শুধোলেন—"বিপরীত আক্কেলের ওঁষুধ কি হোতো জমাদারজী, লাঠি-সোঁটা বেত?"

"হাঃ হ্! সে ওর মালিক হরগিজ দিতে পার্‌তো। তাতেও না হলে অন্য দাওয়াইও ছিল।"

"স্ত্রীবুদ্ধির টাল সামলাবাব ওষুধ দিতো কোন ওঝায়?"

"হাঁ-হাঁ, ওষুধ দেনেওয়ালা ওঝা ছিলো, বৈদ্ভি ছিলো। আর এমন একজন হকীম ছিলো যে আয়ুর্বেদ বৈদ্দক্, য়ুনানী দওয়া, ঝাড়-ফুক মন্তর সবকিছু পার্‌তো।"

"সে মহাপুরুষের নামটি কি জান্‌তে পারি ?" বড়দা বল্লে একটু ঠাট্টার সুরে। উত্তর এলো গম্ভীর সুরে—"হকীম হুড়ুকবাজ।"—

নামের ঠেলায় বড়দা তো কাত। সবাই একটু থাম্‌লে পরে, লালু বল্লে—"ব্বাস্ রে! নাম নয়তো যেন মাথায় দুই ডাণ্ডা। হু-হু-হুড়কো বাজ।"

গণেশ বল্লে—"আরে দূর! ওটা-জমাদারের গুল। ওরকম নাম কি কখনো কারো হয়?"

তার এই কথায় জমাদার মুচকি হেসে বল্লে—"এই শুনো, মুরখকী বোলী! অরে গণেশ মহারাজ, আমার বুদ্ধু বাবা, হুড়ুকবাজ হোলো বাবা বিশ্বনাথ মহাদেওর নাম।"

নরেশবাবু একটু সামলে নিয়ে জিগ্যেস করলেন—"তা জমাদারজী, ওই হুহুরী লোকটির হুড়কো-ঠেঙ্গার বহর আপনি কিছু দেখে-শুনে থাক্‌বেন নিশ্চয়?"

"হাঁ হাঁঃ। হুনর্ তো ছিল অনেক তার। তবে হুড়কা ঠেঙ্গা সে দিতো না, দিতো জড়িবুটি, গোলী চুরণ এইসব। আর কি কাজ দিতো তার দাওয়াই। কেমন ঠিক করে দিলো, মেঘরাজ তেলীর বহু আনুসুয়াকে"—

ছোটদের দল বুঝলো যে আর একটা জোর গল্প এলো বলে। তারা সব এগিয়ে ঘিরে বসলো জমাদারের চারপাশে। বড়রাও নিজেদের মান বজায় রেখে যতটা পারলো কাছে সরে এলো। গণশা বল্লে—"হ্যাঁ জমাদার। সেটা কি হয়েছিলো?"

সকলে তো গল্প শুনতে উৎসুক। জমাদারজী কিন্তু কোনই উচ্চবাচ্য করে না। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক ভাব দেখায়। শেষে মণ্টু আর না থাকতে পেরে বল্লে—"কি হোলো জমাদার, কিছু বলছ না কেন?"

"কিসের কি বল্‌ব?"

"কেন, তোমার সেই মেঘনাদ তেলী আর তার আরশুলো বউয়ের কথা—"

শুনে তো জমাদার হেসেই আকুল। পরে বল্লে—"হেহ্-দেখো মণ্টুদাদার আক্‌কলের দৌড়। কাঁহা রইল মেঘরাজ আর কৌন হইল মেঘনাদ: আর কে তো ছিল আনুসুয়া বহু, সে হইল আরশুলো পোকা! হেহ্ হেহ্ হেঃ"—

হীরেনবাবু আর্টিস্ট লোক, তাঁর ভাবনা হোল গল্পটা বুঝি মাটি হয়, তিনি বুঝিয়ে বল্লেন—"শোন মণ্টু, মেঘরাজ হলেন ইন্দ্র, আর মেঘনাদ হলো ইন্দ্রজিৎ, রাবণের বেটা, আর অনসূয়া হলেন ঋষিকন্যা, শকুন্তলার সখী"—

ভুলুবাবু যাত্রার দলের জুড়ীর মত গেয়ে উঠলেন—"আর আরগুলো হলেন তেলাপোকার বেটী, ড্রেন নর্দমার পাখী—"

গণশা এবার চটে বল্লে—"ভুলুদা গল্পটা মাটি করে দেবে দেখছি।—তুমি বলনা জমাদার, তোমার ঐ-ঐ, মেঘরাজার কথা"—

জমাদার উঠে সোজা হয়ে বস্‌ল। তারপর গম্ভীর গলায় বল্লে—"শুন্ তবে বলি। কিন্তু গোল করিয়ো না, চুপচাপ শুনে যাও"—

"কানপুরের কাছে এক গাঁও, গয়েবি-সরায় তার নাম। বহুত লোক সেখানে থাকে। ছোট, বড়, জমিদার, তালুকদার, মিস্ত্রী, মজদুর, কিষাণ আরও কত। সেখানে থাক্‌তো এক গরীব তেলী দুধনাথ, তার স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে। ছেলের নাম ছিল মেঘরাজ। দুধনাথ ছিল বড়া গরীব। সে তেলী ছিল, কিন্তু তার কলু ছিল না—"

বড়দা বল্লে—"সে আবার কি রকম? তোমাদের দেশে কি কলু ছাড়া অন্য জাতের তেলী হয় নাকি?"

"অরে, ক্যা আফদ বংলা বোলীকে! অরে সে তো জাতে তেলীই ছিল, কিন্তু তার কোল্‌হু ছিল না, যাকে তোমরা বল ঘানি। সে দুসরা তেলীর কাছ থেকে তেল নিয়ে মাথায় করে গাঁও গাঁও অল্লি-গল্লি ফেরি করে ফিরতো। যেদিন ভাল বেচা হোতো সে দশ বার আনা পেয়ে যেতো। তার বহু অন্য লোকের বাড়ি খাটতো।

যখন মেঘরাজ বড় হতে লাগল তখন দুধনাথ বল্লে—"এবার বেটাকে সাথে নিয়ে ফিরি। সে কিছু না হোক পথ ঘাট তো চিন্‌বে।"

তার মা বল্লে—"তা হবে না। আমাদের দুঃখের বোঝা ওকে কাঁধে উঠাতে হবে না। ওকে লিখাপড়া শিখাও। ও ভাল কাজ করবে, ভাল সাদি-বিয়া কর্‌বে।"

দুধনাথ বল্লে—"হাঁ। তোর বেটা লিখিপড়ি করে মাজিস্টর-দরোগা হোবে। তোকে হাতিতে চড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমি পারবনা ওকে পড়াতে।"

মেঘরাজের মা বল্লে—"আমি পড়াব। কানপুরে নূতন তেলের কল খুলেছে। আমি ভোরে রেঁধে তোদের খাইয়ে চলে যাব তিন কোশ হেঁটে। মাসে দশ পনেরো টাকা পাবো।"

তাই ঠিক হোলো। মেঘরাজের মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের পাঠশালায় বসিয়ে দিলে পুঁথী পাটা তথতি নিয়ে। সে লিখাপড়া শুরু কল্লে, "রামাগতি দেহু সুমতি" বলে।...

সাত আট বরষ কেটে গেলো। মেঘরাজ পাঠশালায়-লিখন-পড়ন, হিসাব শেষ করে

মিডিল ইস্কুলে গেলো কানপুরে। সেখানে অংরেজি শিখলো, উর্দু শিখলো, মিডিল পাস করল। তখন তার মা তাদের গাঁয়ের বড়লোক গয়াদীন তেলীকে রাজা মহারাজ বলে খোশামোদ করল। তার হাথ-পায়ে ধরল, গোড়ে গিরল। সে রাজী হোলো মেঘরাজকে তার তেলের কলে রাখতে। ঠিক হোলো সে সন্ধ্যাবেলায় খাতবহি লিখবে আর তার বদলে থাকতে খেতে পাবে, আর স্কুলের পড়ার খরচা মাসে পাঁচ টাকা পাবে। মেঘরাজের মা স্বপন দেখতে লাগলো ছেলের চাকরি, বাড়ি, জুড়ি, গাড়ির।

কিন্তু স্বপন সে স্বপনই রয়ে গেল। কানপুরে এলো পিলেগ কি বিমারী। লোকজন মরে ভূত হতে লাগল। মরলো মেঘরাজের মা। তার বাপ ছেলের হাত ধরে পালালো গাঁও ছেড়ে।...সাল দেড় সাল ঘুরে ফিরে ভুধনাথ এলো গাঁয়ে। তার ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে গেছে। মাল তা কিছুই ছিল না ঘরে কিন্তু খিড়কি দরওয়াজা যা ছিল তাও লোকে নিয়ে গেছে। সে দেখে হায় হায় করে কাঁদলো। পরে ছেলেকে সাথে নিয়ে গেলো গয়াদীনের বাড়ি।

গয়াদীন বল্লে—"অরে ভুধনাথ, দেড় বরষ কোথা থেকে এলি? কি চাই তোর?"

সে বল্লে—"মহারাজ আমার কিছুই চাইনা। আমার লোটা-কম্বল যা আছে আছে। আমার ছেলের লিখাপড়া আর খাওয়া থাকা যদি আপনার মরজিতে হয় তো এ গরীব দোয়া করবে।"

"অরে ধুসস্—তোর বেটার ঢের লিখাপড়া হোয়েছে। ও নোকরী চাকরি চায়তো আমার কানপুরে নূতন বেড়ীর তেলের কলে কাজ দিতে পারি। সেখানে হপ্তায় ছয় দিন কাজ করবে, খাবে শোবে আর পাঁচ টাকা মাইনা। ছুটির দিন এখানে এসে আমার ঘরের খাতাবহি লিখবে আমার খিদমত করবে তো আরো মাসে দুই টাকা, ব্যস্"—

ভুধনাথ বল্লে—"হুজুর মা, বাপ।" ছেলে সেখানে ভর্তি হোলো, আর বাপ গয়াদীনের কাছে তিন টাকা ভিখ মেগে, চিলিম্ চিমটা ঝোলা নিয়ে, বম্ মহাদেও বলে, দেশ ছেড়ে বৈরাগী হয়ে চলে গেলো।..

মেঘরাজ কলে কাজ করতে লাগলো। তিন চার বছরে সে মিস্ত্রীর কাজ শিখলো, হিসাব শিখলো। বেড়ী, সরষো, তিল, অলসী, এসব কিছুর ভাল-মন্দ যাচাই করা শিখলো। কিন্তু তার কাজে মন বসলো না। সে তো ইস্কুলে পড়েছিলো কিনা, তার মাথা সেখানে বিগড়ে গেছিলো।

সে হিসাবের খাতা বহির সঙ্গে লুকিয়ে রাখতো কিস্সা কহানীর কিতাব, গোলেবকাওলি,

অলিফ লয়লা আরো কতো কি। কলের ঘানির ঘোরার আওয়াজের সঙ্গে সে গান গাইতো ঠেটর নাটক এই সবের। আর কাজ হয়ে গেলে অন্য লোক যখন সংসারের কথা বলতো, সে স্বপন দেখতো রাজারানীর, হুরী-পরীর। গরীব লোক বেশী কিতাব পড়লে মাথার বদ্‌হজমী হয়, ওর তাই হয়েছিল।

হফতায় একদিন সে যেতো গাঁয়ে গয়াদীন তেলীর বাড়িতে। সেখানে হুজুরকে কলের খবরাখবর দিয়ে সে বাইরের হাতার কূয়ার জলে সাবান দিয়ে আস্নান করে, রঙ্গীন কমিজ কোট, সাদা পায়জামা পরে, পায়ে জুতা পবে, মাথায় লক্ষ্ণৌয়েব জরীদার বাঁকা টোপী চড়িয়ে, গয়াদীনের ফুলওয়ারার ফুলের বাগিচাব ছায়ায় বসে গান গাইতো।

একজন ভালো পোশাক জামা পরা নওজোযান গাচতলায় বসে গান গাইছে।

একদিন গয়াদীনের এক মেয়ে পুজোব জন্যে ফুল তুলতে গিয়ে শুন্‌লো কে গান গাইছে। সে তার সখী সহেলীদেব সঙ্গে আড়ালে গিয়ে দেখলো একজন ভালো পোশাক জামা পরা নওজোয়ান গাছতলায় বাস গান গাইছে। সখী-সহেলীরা কেউ তাকে চিন্‌তে পার্‌লো না। মেঘরাজের চেহ্‌রা ভাল ছিল গানও ভাল গাইতো। সকলে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে গান শুনলো।

রাতে খাবার সময় মেয়ে গয়াদীনকে বল্লে—"বাবুজী আপনার ফুলওয়ারায় যে নওজোয়ান-বাবু আজ গান গাইছিলেন তিনি কে ?"

গয়াদীন বল্লে—"হাঁ-আ, আমার ফুলওয়ারায় বসে গান গাইছিল ? কে সে ?" তখনি হুকম্ হোলো মালীকে ডাকবার।

মালী বল্লে—"আরে বাবু আবার কে ? ও তো মেঘরাজ, হফতায় একদিন সে কোট পায়জামা টোপী চড়িয়ে নবাব বনে, ওখানে হাওয়া খায়। সেও হুজুরের নোকর আমিও নোকর। কাজেই আমি কিছু বলিনা।"

গয়াদীন পুছলে মেয়েকে—"তুই ঠিক শুনেছিস ও গান গাইছিল ?"

মেয়ে বল্লে—"হুঁ। বেশ ভাল, নতুন গান। শহরে খুব চল্‌ছে, 'চিন্‌হুত নাহী, বদজী গয়ো নয়নারি—'"

গয়াদীন গানেব কথা শুনে গম্ভীব হয়ে বল্লে—"এতো ভাল কথা নয়। রও আমি ঠিক করছি ও বেটাকে।"

পবদিন সকালেই মেঘরাজের ডাক পড়ল। হুজুরের হুকম্ হোলো—"তোর বয়স হোয়েছে, আমি তোর বিয়া দেবার ঠিক করেছি। আস্‌ছে বুধবার দিন ভালো আছে, সেদিন তোকে ছুটি দেবো, তুই এখানে এসে বিয়া কব্‌বি।"

মেঘবাজ তো আকাশ থেকে পডে গেলো—"আমাব বিয়া কার সঙ্গে !"

"তুই তো গরীব লোক, মজুবী কবে খাস্। তোকে মেয়ে কে দেবে ? ঐ মাতাভিকটা মরে গেছে, রেখে গেছে তার স্ত্রীকে আর একটা মেয়েকে। তাদের খাওয়াতে হয় আমাকেই। ঐ মেয়েটাকে তুই বিয়া কর আব খরচা যা লাগে আমি দেবো। তুই মাহিনা থেকে দু'চার বছরে শোধ দিয়ে দিস্। যা এখন কাজে যা, বুধবার সকালে ছুটি নিয়ে আসিস্, বলিস আমার হুকম্।"

মেঘরাজ চুপ কবে শুন্‌লে। তারপর দেউড়ীতে গিয়ে জমাদার হরদেও সিংকে বল্লে—"ঠাকুর সাহাব, এখানে মাতাভিকেব বিধবা আর তার মেয়ে কে আছে ?"

জমাদার কুয়োর পাডেব দিকে দেখিয়ে বল্লে—"ওই তো, বরতন মাজছে মা আর মেয়ে।"

মাতাভিকের মেয়ের রং ছিল তেল মাখা ঢোলের মত। তার ছোট ছোট গোল গোল চোখ নাক তো একরকম ছিলই না, অওর দাঁত বড়ো বড়ো। চেহ্‌রা-বদন গোল, পালিস্ করা, যেন গুজরাতী ভঁইসের বাচ্চা। লেকিন নাম ছিল সুন্দরীয়া।

হীরেনবাবু বল্লেন—"বাহবা নাম"—

জমাদার একটু হেসে বল্লে—"দেখেন না! যাহোক বেচারা মেঘরাজের ওই সুন্দরীকে দেখে মাথা ঘুরে গেল। তার অতো হুরী-পরীর স্বপনের নেশা উড়ে গেল এক মিনিটে। সে ছুটে গিয়ে গয়াদীনের সামনে হাত জোড় করে বল্লে—হুজুর মাফ্‌ করেঁ। আমি ওই সুন্দরীয়াকে সাদী কর্‌তে পার্‌ব না।"

গয়াদীন ধমক দিয়ে বল্লে—"চুপরও বদমাস্‌। সাদী করবেনা আর লুকিয়ে বড় ঘরানার মেয়েদের সামনে নাটকের গান গাইবে। সাদী করো নহীতো অভী নিকল্‌ যাও!"

মেঘরাজ আর কি বলে। সে সারাপথ ভাবতে ভাবতে কানপুর ফিরে গেলো। সেখানে গিয়ে কলের মানেজারকে বল্লে—"হুজুরের হুকম্‌ হয়েছে আমার উপর সাদী করার জন্যে। তো আমার হিসাবের টাকা দিন, কাপড়চোপড় কিন্‌তে হবে।"

মানেজর বল্লে—"আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি।" খবব সেই দিনই এলো অন্যলোকেব সঙ্গে।

পরের দিন সকালে মেঘরাজ কাপড-জামা করাবে বলে ছুটি নিয়ে শহর ভোর ঘুর্‌লে, কোথাও কিছু মিল্‌লো না। সন্ধ্যাবেলায় কানপুর স্টেশনেব সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে কি কর্‌বে, পরদিনই তো সাদীর দিন। কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছেনা, এমন সময় দেখলে কি পঁচিশ-ত্রিশ জনা মরদ আর আট দশজনা জনানা বাকস্‌ গাঁঠরি নিয়ে এসে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে, তার মধ্যে ওর চেনা এক ছোকরাও আছে।

সেই ছোকরাকে জিগ্যেস কর্‌লে কোথায় তারা যাচ্ছে? তাতে সে বল্লে—"পর্‌দেশ। সেখানে রোজ তুই টাকা মাহিনা অওর খাওয়া পরা পাওয়া যায়।" মেঘরাজ পুছলো—"সেখানে যেতে খরচা কত?" তাতে ছোকরা বল্লে—"কিছু না। কুলী-সর্দাব রাজী হোলে বিনা খরচায় কাপড় কম্বল, আরো পাঁচটাকা নগদ দিভে, সেই সঙ্গে রেলখরচা সবই। শুধু একটা কাগজে আঙুলের টিপসই দিতে হবে।"

ওদের কথা শুনে কুলীর সর্দাব সেখানে এলো। এসে সে বল্লে—"এই ফারমে টিপ সেই দেও, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

মেঘরাজ তো যেন হাতে আসমানের চাঁদ পেল। টিপসই লাগিয়ে বেলে চড়ে বসলো। দু'দিন পরে কলকাতায় এলো, সেখানে তিনদিন থেকে জাহাজে চড়ে রওয়ানা হোলো পরদেশে। এই রকমে কুলী-হড়কট্টির পাল্লায় পড়ে মেঘরাজ গেলো চিনিদাদ্‌।

ঝুলুবাবু বল্লে—"অ্যাঁ! সে আবার কি? হাড়কাটে পড়ে চিচিংফাক; কি যে বলো জমাদার"—

নরেশবাবু বল্লে—"দূর গাধা, ও বলছে কুলীর আড়কাটির পাল্লায় পড়ে ও গেল [illegible]নিডাড্। তখন তো ঐ রকম কুলী চালান হরদম হোতো। তাদেরই তো বংশধর তোমাদের [illegible]ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলার রামাধীন আর সব"—

বড়দা বল্লে—"বুঝেছি, বুঝেছি—হাঁ, জমাদার তারপর ?"

জমাদার বল্লে—"তারপর চৌদ্দা পনরা সাল চলে গেল। ছোকরা মেঘরাজ পালিয়েছি[illegible] ফিরে এলো জোয়ান মরদ। এই লম্বা, এই তাগড়া। আর সে নিয়ে এলো হাজার হাজার সোনার মোহর, গিনি, আশরফি, আর বাক্স-ভর্তি ইংলিস টাকার নোট। গিয়েছিল গরীব, ফিরে এলো লখ্ পতি আমীর শওকার"—

গণেশ বল্লে—"কোথেকে পেলে সে অত টাকা।"

জমাদার বিরক্ত হয়ে বল্লে—"সে আমি কি জানি। ও নিজে বল্‌তো ভূঁইচালে চিনিদাদের এক পুরানো ইমারত ধসে ভেঙ্গে যায়, সে ওখানে লুকানো টাকা পেয়েছিল।

ভুলু বল্লে—"আ! গণশার যত আজগুবী প্রশ্ন।' তুমি গল্পটা বল জমাদার"—

মেঘরাজ ফিরে এলো দেশে। কিন্তু দেশ তখন বদ্‌লে গেছে। সে যখন পালিয়েছিল তখন রাতের আধারে উজালা আনতো রেড়ীর তেল। বড়লোকের বাড়িতে বেলওয়ারী ঝাড়ে থাকতো মোমবাতি। তখন পথে ঘাটে লোক চল্‌ত হেঁটে, বয়েল গাড়িতে আর ঘোড়ার টাঙ্গা বগি জুড়িতে। বড়লোকে চড়ত সুন্দর বয়েলে টানা রঙ্গীলা রথে, কি তো দু-ঘোড়া চার-ঘোড়ার জুড়িতে। শৌকিন লোকেরা যেত তেজী ঘোড়ায় টানা রবড় চাকার টম্‌টম্ হাঁকিয়ে হওয়া খেতো।

মেঘরাজ যখন ফিরলো তখন মাটির তেল—যাকে তোমরা বলো কেরাসীন—হটিয়ে দিয়েছে রেড়ীর তেলকে। বড়ো অমীর লোক তো বিজলী বাতি জ্বালছে, লাট বেলাটের নকলে। আর মোটর গাড়িও চলতে আরম্ভ করেছে দুটো চারটে। তার আওয়াজ খুব, ঘোড়া ভড়্‌কায়, ভঁইস বয়েলও ভয়ে পালায়।

গাঁয়ের বড়লোক গয়াদীন মরে গেছে। তার দু'দুটো তেলের কল ছিলো। মাটির তেলের চাপে একটা কল বন্ধ, অন্য কলও ভাল চলে না। গয়াদীনের ছেলেরাও ফাটকা সট্টা জুয়া খেলে অনেক টাকা খুইয়েছে। তাদের বাড়ি মরম্মত হয় না, আর সেই শেরওয়ালী কোঠী, ফুলওয়ারা যেখানে গাছের তলায় গান গেয়ে মেঘরাজকে পালাতে হয়েছিল, সে তো প্রায় ভূতের বাড়ি।

মেঘরাজ দালাল লাগিয়ে সেই শেরওয়ালী কোঠী কিনল, আর লোকজন মিস্ত্রী লাগিয়ে,

বাগিচা সাফ-সুতরা করিয়ে, ঘর দালান মরম্মত করিয়ে, বসে গেল গাঁয়ে— অমীর লোক বনে। নোকর-চাকর চাকরানীতে বাড়ি ভরে গেলো। আর ফুলবাগানের খবরদারী করার জন্যে খুঁজে এনে রাখলে সেই পুরানো মালীকে, যে ওকে বাগানে ঢুকতে দিতো যখন সে ছিল গয়াদীনের চাকর।

টাকা খরচা হোতে লাগল, আমদানী নাই। সে সল্লা করলে দু'চারজনের সঙ্গে, করে গয়াদীনের যে কলটা বন্দ ছিল সেটা সস্তায় কিনে, নূতন এঞ্জিন বসিয়ে অল্‌সির তেলের কারবার শুরু করলে, যাকে তোমরা বলো তিসির তেল। আর সেই মালীর সঙ্গে সল্লা পরামর্শ করে জাত ব্যবসা হিসাবে বাড়ির হাতায় আলাদা ঘর করে ঘানি বসালো তিল তেলের। সেই তেলের সঙ্গে বিলায়তি খোসবো মিশাল করে সুন্দর বোতলে পুরে, নক্সাদার মোড়কে ভরে, ডবল দামে বেচতে লাগল। মোটা আমদানী শুরু হোলো। সকলে বল্লে—"হাঁ মেঘরাজ একটা অক্কলমন্দ, সমজদার বড়োলোক হয়েছে।" তার খুশামোদ করতে দশ-বিশটে লোকও লেগে গেল। সবাই বল্লে—"মেঘরাজ এবার বিয়া-সাদী করো।" মেঘরাজ শুনলে সব কিন্তু কিছু বল্লে না।

আরও দিন গেল, আরও অনেক টাকা এলো, লাখে লাখে। সে বাজার মহালের মত বাড়ি ঘর বানালো লাল পাথর লাল ইটের। বাগিচা তার ভরে গেল ফুলে ফলে। চমেলী, বেলা, চম্পকের সুগন্ধে মিঠা হয়ে উঠ্‌তো, গুলাব, নরগিসের নানা রঙ্গে রঙ্গিলা সেই বাগিচার হাওয়া। আর তারই মাঝে একটা ছোট ফোয়ারাদার চহ্‌বাচ্চার পাশে, ল্যাংড়া আমের গাছের নিচে, সাদা সিক্‌মর্‌ওয়র্‌ পাথরে বাঁধানো চবুতরায় বসে, মেঘরাজ সন্ধ্যাবেলায় ঢোল বাজাতো আর সেই পুরানো দিনের শেখা গান গাইতো। তার টাকায় যারা খেতো পর্‌তো তারা পাশে বসে বল্‌তো—"ওয়াহ্‌, ওয়াহ্‌, আমাদের বাবু মেঘরাজ কি সুন্দর গানা গায়, ঠিক যেন মিঞা তানসেন।"

তার নিজের লোকবাগ সবাই খুশ্‌ ছিল! কিন্তু গাঁয়ের ব্রাহ্‌মন্‌ লোক খুশ্‌ ছিল না। ছোট জাতের লোক লাখ্‌ লাখ্‌ টাকার মালিক, কিন্তু ব্রাহ্‌মন্‌ পণ্ডিতদের কিছু মিলে না। যে বাড়ির মালিক আছে মালিকান্‌ নাই, না বিবি, না বাচ্চা, না চাচি, না মৌসি, সেখানে ব্রাহ্‌মনের পেট ভরাবে কে?

গাঁয়ের শিবালয় মন্দিরের পূজারী প্রোহিতের দল মিলে সল্লাহ্‌ করলে। তারপর সেই শিবালয়ে যে সব সন্ন্যাসী আস্‌তো তাদের একজনকে ডেকে সব কিছু বল্লে। সে বল্লে—"ঠিক আমি বেটাকে ঢিট্‌ কর্‌ছি।"

পরদিন বিকালে মেঘরাজ সেই সাদা পাথরের চবুতরায় বসে ঢোল নিয়ে মনের আনন্দে গান গাইছে আর তার লোকজনের বাহবা শুনছে, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী এসে সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে "বম্ মহাদেও, ভোলা মহেশ্বর!"

মেঘরাজ দেখলে লম্বা সন্ন্যাসী, মাথে পাহাড় বরাবর জটাজুট। গায়ে বদনে ভসম্ বিভূতি, আঁখ জবাফুলের মতো লাল, হাতের ত্রিশূল ঝকমক্ করছে শেষ পহরের রোদের আলোয়। তার ভয়ও হোলো, ভক্তিও হোলো; সে উঠে এলো পায়ে লাগতে পরণাম কর্তে।

সন্ন্যাসী হেঁকে বল্লে—"ফবক্ রহো বেইমান, নমকহারাম পাপিষ্ঠ! ছুয়ো মত্!"

মেঘরাজ ডবিয়ে পিছু হটে দাঁড়াল, তারপর হাথজোড় করে বল্লো—"কি অপরাধ আমার মহারাজ? কি পাপ করেছি।" সন্ন্যাসী ধমকে বল্লে—"কি পাপ? হন্ দেখ; হোই আসমান পর যেখানে সূরজ লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে তার উপর"—

মেঘরাজ ভয়ে ভয়ে সেই আকাশের দিকে মুখ তুলে মিটি মিটি তাকালে।

সন্ন্যাসী পুছলে—"দেখলি?"

মেঘরাজ ভয়ে ভয়ে বল্লে—"না মহারাজ আমি তো কিছু না দেখলো।"

সন্ন্যাসী বল্লে—"আরে তবে শুন্ হামি বোলি। হোদ্দেখ, তোর বাপ দুধনাথ ছাতি পিটছে আর চিল্লাচ্ছে, হোই শুন্ তোর মা মাথে পরি ধূল ছাই মাখছে আর কাঁদছে।"

"কেন কাঁদছে মহারাজ?"

"সে তো ওরা বোল্ছে; ভুখা আছে, পিয়াসী আছে; তুই না ওদের খাওয়ালি, না পিয়াসে পানি দিলি। আরে, পাপিষ্ঠ! ধরম ডুবায়ে দিলি?"

"তো আমায় কি করতে হবে বাবা?"

"আরে ব্রাহ্মন্, সন্ন্যাসী, সন্তদের খাওয়া, ওদের পেট ভরবে। ব্রাহ্মন্‌কে দিয়ে গঙ্গাজল তর্পন করার ব্যবস্থা কর, ওদের পিয়াস যাবে। তোর মা যখন মরলে তু ছিলি বালক, আজ তোর ছত্তিস সাল বয়স। বাপও মরল আজ পনরা বরষ, তুই না করালি পূজাপাঠ না দিলি ব্রাহ্মন্ প্রোহিতকে দান। ধরম ডুবালি তুই, বেইমান।"

মেঘরাজ তো ভয়ের চোটে তখুনি পূজাপাঠ ব্রাহ্মন্ ভোজন সব কিছুতে রাজী হোলো। তরপরই ঘটা করে পূজাপাঠ হোলো, দান ধ্যান হোলো। ব্রাহ্মনেরা পেট পুরে পুরী কচুরী দহি লাড্ডু পেঁড়া খেল।

কিন্তু ব্রাহ্মনের পেট তো কখনো ভরে না। প্রথম বরষ একবার খেলো, খুশি রইলো।

কাগ্‌তুয়া, তোতা দেখ্‌তে। সুন্দর চিড়িয়া দেখে মেঘরাজের পসন্দ হোলো। সে 'পড় বেটা, রাধেশ্যাম' বলে তার মাথায় যেমন আঙুল দিতে গেছে অমনি পাখিটা তার আঙুল কামড়ে খুন বহিয়ে দিলো। মেঘরাজ "অরে বাপরে, কাটিস রে" বলে যেমন চেঁচাল, তুলারী অমনি খিলখিল করে হেসে ঢলে পড়লো। সে হাসি যেন থামে না; যত কাটা আঙুলে খুন বহে ততো সে হাসে।

দুসরাবার তুলারীর হাসি শুনলো মেঘরাজ, দসেরায় কানপুর সরসেয়া ঘাটে স্নান করতে গিয়ে। তুলারী, অর মা আর দুই ভৌজি তাদের বাচ্চাদের নিয়ে স্নান কবতে গেলো সেই সুন্দর রথে চড়ে। পিছনে এক ভাড়ার ঘোড়া গাড়ি চল্‌ল। তার ভিতরে তুলাবীর দুই ভাই আর গাঁয়ের পূজারী ব্রাহ্‌মণ্‌। ভিতরে জায়গা হোলোনা তাই মেঘরাজ বস্‌লো ছাদের উপরে।

ঘাটের পথে মোটর গাড়িব হারন্‌ আর তাব গম্‌গম্‌ ধড়্‌ ধড়্‌ আওয়াজ শুনে বথের দুই বয়েল ভড়্‌কে জোত ছিঁড়ে, এক ঢুঁস্‌ মারলো মোটর গাড়িতে। মোটর গাড়ি বাঁচাতে গিয়ে ধাক্কা মারলো ঘোড়া গাড়িতে। ঘোড়া ভড়কে গিয়ে রাস্তাব পাশেব দোকানে ধাক্কা মেরে, তার কাচ পাথরের মাল, আরও কত কিছু চুরমাব করে গাড়ি দিলো উল্টে। মেঘরাজ পড়ে গিয়ে বিষম চোট খেলো, তার হাত, পা, মুখ মাথা, কেটে ফেটে, রক্তারক্তি হোলো।

বেচারা গা কাপড় ঝেড়ে, রাস্তাব পাশের কলে খুন ময়লা ধুয়ে সাফ্‌ হচ্ছে, এমন সময় তাকে পুলিসে ধরল। দোকানদার আর মোটবের মালিক খেসারতের নালিশ করে দিলে তাকে ধরিয়ে। যখন তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সে দেখ্‌লে তুলারী হেসে লুটোচ্ছে আর সেই সঙ্গে হাস্‌ছে তার মা, দুই ভাই আর তাদের দুই বৌ। আর হাস্‌ছে পথের মাঝে যতলোক। শুধু হাস্‌লোনা মেঘরাজ।

গায়ে চোট, কাপড়ে রক্ত আর ময়লা মাখা হয়ে, সে তিন চারশো টাকায় খেসারতের রফা করে ফিরে গেলো ঘাটে। সেখানে শুন্‌লো অন্যেরা স্নান শেষ করে ফিরে গেছে গাঁয়ে।

ঐ রকমের একবার তুলারীর ভাইয়ের বুলটেরিয়া কুত্তা যখন মেঘরাজের পা কামড়ে ধরেছিল তখনও তুলারী হেসে গড়িয়েছিল। যখন পায়ের জ্বালায় আর রাগে মেঘরাজ লাঠি দিয়ে কুত্তাকে মারতে গিয়েছিল তখন তুলারীর দুই ভাই লাঠি নিয়ে তাকে মারতে যায়, আর তুলারী তার মা আর দুই ভাবি ভৌজি সুর্পনখার মত হাঁ করে চেঁচিয়ে, গালি দিয়ে, তাকে ভাগিয়ে দেয়।

সব শেষ হোলো দেওয়ালির রাতে যখন তুলারীর ছোট ভাইয়ের রূপী বান্দর জলন্ত দিয়া

নিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে মেঘরাজের গোশালায় বিচালীর গাদায়। আগুন দেখে গরু, ভঁইস, বয়েল, সব খোঁটার দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চেষ্টা করলো। ওদিকে মেঘরাজ লোকজন নিয়ে আগুন নিবিয়ে গোশালা আর গরু বাছুর বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সারারাত্ত চেষ্টার পর আগুন নিবলো।

গরুর গুঁতো লাথির ঘা খেয়ে, কাদা গোবর লেপ্টে, আগুনে ঝল্‌সে, ছাই কালি মেখে মেঘরাজ ভোরের দিকে এলো বাড়ির ভিতর। এসে দেখ্‌লো তার দুই শালা তাদের বৌ-ছেলে নিয়ে, আর সেই সঙ্গে দুলারী তার মা ঝি সবাইকে নিয়ে সকালের জলখাবার খাচ্ছে আর তাদের সামনে কুকুরগুলো আর বান্দর দুইটাও প্রসাদ পাচ্ছে।

মেঘরাজের চেহারা দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। বড় শালা তার দিকে তাকিয়ে দেখে বল্লে—"অরে ভালু কা বাপ্, ইধর্ আয়া ক্যয়সে?" তার ছোট ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে নেচে নেচে বল্‌তে লাগ্‌লো—

"আয়া ভালু কা বাপ্, আয়া ভালু কা বাপ্।" মেঘবাজ রাগেব চোটে একটা ছেলেকে এক চড় মারল, আব সঙ্গে সঙ্গে ঘরে কুরুক্ষেত্রেব লড়াই লেগে গেল।

বেচাবা মেঘরাজ বেইজ্জতির চূড়ান্ত হয়ে, মার খেয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে গেল তাব সেই পুবানো বন্ধু মালী।

মেঘরাজ হতাশ ভাবে বল্লে, "মালী ভাই, চল্ আমবা এসব ছেড়ে কানপুরে চলে যাই। সেখানে আমাব তেলেব কলেই আমি থাক্‌বো। চাইনা বৌ, চাইনা ফুলবাগান, চাইনা পাথরেব মহালসমেত এই শেরওয়ালী কোঠী।"

মালী বল্লে, "উহুঁ! তা কেন? চল্ আমরা কানপুবেই যাই। সেখানে হকীম হুড়ুকবাজ এসেছেন। তিনি মহা পণ্ডিত, জ্যোতিষী, আরো হকীমী, বৈদ্যক সব দাওয়ায় সিদ্ধ। তাঁর কাছে এর উচিত ব্যবস্থা চাই।"

মেঘবাজ বল্লে, "তাই চল্।"···

অনেক কষ্টে তো হকীম হুড়ুকবাজেব দেখা পাওয়া গেল। লম্বা রোগা শরীর, মুড়ানো মাথায় লম্বা টিকী। তার কপালে বক্তচন্দনের তিলক, চোখ দুটোয় যেন বিজলী খেলছে, নাক যেন গরুড়ের ঠোঁট। গায়ে চাদব জড়িয়ে আসনে বসে আছেন, ঘরে ধূপ ধুনা জ্বলছে, চারিধারে লোক। মেঘরাজ সামনে গিয়ে, সোনার মোহর রেখে দণ্ডবৎ প্রণাম কবলে।

হকীম বল্লেন, "জিতা রহো। তুমি কে, কি চাও?" মেঘরাজ বল্লে, "হুজুব, অন্নদাতা,

আমার নাম মেঘরাজ, থাকি গয়েবি-সরাই গ্রামে। বুদ্ধির দোষে বিয়ে করে বিপদে পড়েছি মালিক! আপনি উদ্ধার করুন।"

হকীম বল্লেন, "গয়েবি-সরাইয়ের শেরওয়ালী কোঠীর মেঘরাজ? সে তো তগড়া জোয়ান মরদ, গাল্‌পাট্টা দাড়ি, লম্বা মোছ। আমি এই কানপুরেই তাকে দেখেছি পাঁচ সাল আগে। তোমার এমন হালত কি করে হোলো?"

হকীম বল্লে "অরে কম্‌-একলাক্‌। তোর সাত জনমের পাপের ফলেই তো এ সব হয়েছে। যা ভাগ্‌!"

মেঘরাজ বল্লে, "গরীব পরবস্‌! যে আমার মোছ ছাঁটিয়েছে, দাড়ি মুড়িয়েছে, সেই চুডাইলই তো আমার সব সত্যানাশের কারণ।" এই বলে সে তার সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলে গেল।

সব শুনে হকীম বল্লেন, "হত্‌তেরী, বেঅকুফ, না-মরদ্‌! সব জোয়ানী খুইয়ে বসে আছিস্‌।" বলে তিনি ভাবতে লাগলেন।

মেঘরাজ একটু পরে হাতজোড় করে বল্লে, "হুজুর, উপায় কি কিছু নেই? যত টাকা লাগে দেব।"

হকীম বল্লেন, "ধুত্তোর রুপেয়া পয়সা। তোর দাওয়াইয়ের জন্যে লাগবে গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, কাভেরী এই ছয় নদীর জল আর দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অওর পুরী এই তিন দরিয়ার পানি। সেই সঙ্গে চাই বদ্‌রিনারায়ণের শিলাজিৎ আর শঙ্করের খড়ি-নমক। যা এ সব নিয়ে আয়, আমি অন্য সবের ব্যবস্থা করছি।"

মেঘরাজ বল্লে, "মায়ি-বাপ! এ সব আনতে তো ছয় সাত মাস সময় লাগবে।"

হকীম বল্লে, "অরে কম্‌-একলাক্‌! তোর সাত জনমের পাপের ফলেই তো এ সব হয়েছে। যা ভাগ্‌!"

"আচ্ছা হুজুর, আমি আন্‌ছি ও সব। আপনার দেখা পাব কোথায়?"

"এখানেই।"...

দেশ-বিদেশ পাহাড-পর্বত ঘুরে, তিন দরিয়া, ছয় নদীব জল খেয়ে, প্রায় এক বছর পর, কানপুরে ফিরে এলো মেঘরাজ, আর তার সঙ্গে এলো তার দুঃখের দুঃখী সেই মালী। বন জঙ্গল, হিমালয়ে চক্কর ফিরে তার চেহ্‌রা ফের আগের মত হয়েছে; ইয়া মোছ, ইয়া গালপাট্টা দাডি। সে গিয়েছিল যেন আধমরা বক্‌রি; সে ফিরে এলো যেন শের-কা-বাচ্চা, তগড়া নও জোয়ান।

হকীমজী তাকে দেখে হেসে বল্লেন, "হাঁ, এবার তুই আমাব দাওয়াই নিতে পারবি। এনেছিস সব মসালা, যা আমি বলেছিলাম?"

মেঘবাজ সবকিছুই এনেছিল। সে সব নিয়ে তিনি বল্লেন, "যা, আজ সারা বদন আর মাথায় সাবান আব মাটি ঘসে গঙ্গাস্নান করে আয়। আমি দাওয়াই তৈরী করে দিচ্ছি। কাল সে সব নিয়ে ঘরে যাস্‌।"

পরের দিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে মেঘরাজ আর মালী দাঁড়াল হকীমজীর সামনে। তিনি বল্লেন মালীকে ডেকে, সমস্ত দাওয়াই বুঝে নিতে। বল্লেন, "ইয়ে দেখ্‌, এই কুপীতে আছে মহাথাণ্ডব তেল। এ বডা জবর তেজদার তেল। আর ইয়ে দেখ্‌ কৌটাতে রয়েছে সল্‌মানি জঙ্গী গোলি। এটা খেতো মুঘল বাদশাহলোক লডাইয়ের আগে। আরও এই শিশিতে আছে রোথ্‌-সঞ্জীবন আসব। আর এই পুরীয়ায় আছে শ্রীমারুতি মহাতাণ্ডব চুরমিশানো কুয়তি মাট্টি।"

মেঘরাজ আর মালী তো হাঁ করে তাকিয়ে সব শুনলে আর দেখলে। হকীমজী আবার মালীকে বল্লেন, "বাড়ি পৌঁছে গেলে আগে ওর মাথায় ঐ তেল খুব ঘষে লাগাবি। সমস্ত

তেল মাথার চামড়ায় ঘষে ঠিক করে লাগে যাতে। তারপর ওই তাকতবর গোলি ওকে খাওয়াবি আর আসবও সেই সঙ্গে পিলিয়ে দিবি। সব শেষে ওর হাত-পা আর ছাতিতে ঐ কুয়ত্তি মাট্টি রগড়ে ভলে মাখিয়ে দিবি।"

মালী এই শুনে ঢোক গিলে বল্লে, "মহারাজ, আমার মালিকান্, মেঘরাজের স্ত্রী, বড়া রাগী। ঠিক বাঘিন্ যেন্‌। আর তার দুই ভাই, দুই বদমাস্-দুষমন। আমি মালিকানের মাথা, হাত-পা ছুঁতেই পাবনা, তো তাকে তেল মাট্টি লাগাবো, দাওয়াই পিলাব, কি করে?"

হকীমজী বল্লেন, "হত্‌তেরী, নাদান বে অকুফ! তুই তেলমাট্টি লাগাবি, দাওয়াই খিলাবি-পিলাবি, মেঘরাজকে—"

ভুলুবাবু বল্লেন, "অ্যাঁ! অসুখ হোলো অনুসূয়া-দুলারীর, আর ঐ সব খাওব-গাওব খেয়ে মোলো মেঘরাজ?"

দারোয়ানজী একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লে, "মর্‌বে কেন? বাঁচ্‌লো তো। শুনেন না।" মালীকে দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা সমঝায়ে দিয়ে হকীমজী মেঘরাজকে বল্লেন—

"শুন্ মেঘরাজ। তুইও তো কম-অক্কল্ বুদ্ধু বোকা। তোকেও আমি সব বাতলায়ে দিচ্ছি। দেখ, এই কানপুর শহরে বিজলীর বাতী জ্বলছে সড়কে আর অমীর মহাজনের বাড়িতে। কিন্তু বিজলীর জনম হচ্ছে ঐ দূরে কারখানায় বিজলী ঘরে। সেই বিজলী তার বেয়ে, পৌঁছাচ্ছে পথে-ঘাটে ঘরে ঘরে। তেমনি আমার দাওয়াইয়েব গুণে তোর গায়ে জন্মাবে মন্তরী তেজ। আর ওই দেখ, ওই সোঁটা, ওটাই হ'ল বিজলীর তার। তুই ওটা জোর মুঠায় চেপে ধরলে তোর বদনের বিজলী ওর মারফৎ পৌঁছাবে ঠিক জায়গায়। ওটা ভোট মুলুকেব পদুম গাছের যাদুগরী ডাল থেকে তৈরী আর ওর মাথা বাঁধানো আছে মন্তর পড়া অষ্টধাতুতে।" এই বলে তিনি এক তিনহাত লম্বা, চার আঙ্গুলভর মোটা, ঘোর লাল রঙের উপর কালো গাঁঠদার ডাণ্ডা মেঘরাজের হাতে দিলেন।

মেঘরাজ আর মালী হকীমজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, রওয়ানা হোলো গাঁয়ের দিকে।..

ফিরে এলো মেঘরাজ শেরওয়ালী কোঠীতে। কিন্তু সেখানে সল্লা-পরামর্শ করে, ফাটকের বাইরেই, এক পিপল গাছের আড়ালে, সে হকীমী দাওয়াই মাখলো, খেলো, আর লাগালো।

মাথায় তেল দিতে গরম হয়ে গেল শির। সমস্ত চুল ফুলে উঠল যেন বব্বর সিংঘির কেশর। বড়ি আর সেই আসব দাওয়াই খেতেই সারা শরীরে যেন বিজলী খেলে গেল। আর সেই চুর মিশানো কুয়তি মাট্টি গায়ে ঘষে মাখতে সারা বদনে যেন আগুন জ্বলে উঠলো।

পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে মেঘরাজ হলো যেন দানোয়-পাওয়া মানুষ। তার চুল খাড়া, আঁখ লাল, যেন আগুন ছুটছে, আর মাথায় যেন ভূত নাচছে। বদনে যেন পাগলা হাতীর জোর এসে গেল। তখন সেই বাঁকুশরী লাঠি জোর হাতে ধরে মেঘরাজ ঢুকলো শেরওয়ালী কোঠরীতে। সে চল্লো ফাটক পার হয়ে, জঙ্গী জনরলের চালে, যেন হনুমানজী গেল লঙ্কা জ্বালাতে।

ঢুকেই সে দেখলে যে, তার সাধের ফুলওয়ারা বাগান নষ্ট হয়ে ঘাস গজাচ্ছে আর সেখানে

দুলারী এগিয়ে এসে বল্লে "আয়েও মেরে রাজা!" ব'লে মেঘরাজের সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে।

সেই বথটানা বয়েল চবছে। দেখে সে রাগে ফুলে বাঘের মত গর্জিয়ে ছুটে গেল বয়েল ভাগাতে। বয়েল দুটো ছিল পাজী, তারা শিংনেড়ে এলো তাকে ঢুঁশ মারতে। যেমন এলো অমনি সেই লাঠি তুলে দমাদ্দম চার পাঁচ ডাণ্ডা লাগালো মেঘরাজ। বয়েল দুটো তো লেজ তুলে পালালো গোশালায়। দুলারীর সাধের বয়েল মার খাচ্ছে দেখে তার ভাইয়েরা ছুটে এলো লোকজন সাথে নিয়ে। সঙ্গে এলো তাদের কুত্তাগুলো। মনে হোলো তারা মেঘরাজকে টুকরা করে ধুলায় মিশিয়ে দেবে।

কুত্তাতো মেঘরাজের নাগরা জুতার লাথ খেয়ে, আসমানে তিন চার ডিগবাজী খেয়ে, পড়লো দূরে। আর মেঘরাজ গর্জাতে গর্জাতে, সেই লাঠি তুলে, ঝাঁপিয়ে পড়লো ওই লোকজনের উপর। তার গায়ে তখন পাঁচটা দানোর তাকত, আর সেই যাদুগরী ডাণ্ডা চল্‌ছে যেন ভীমসেনের গদা। ওঠে আর পড়ে, আর যার গায়ে পড়ে সে একেবারে গিরে লোট্‌পাট খায় মাটিতে। মেঘরাজ লাফাচ্ছে যেন হনুমানজীর চেলা, আর চল্‌ছে লাঠি—দে' ডণ্ডা, দে ডণ্ডা আর দে ডণ্ডা!

মেঘরাজকে ঘিরে যখন সেই ধুম লড়াই শুরু হোলো, তখন সোরগোল শুনে দুলারী আর তার মা, ভাবী সবাই ছুটে এসেছিলো দেখ্‌তে, যে কি হোলো। মেঘরাজকে দেখে তার মা আর ভাইয়ের স্ত্রীরা চীৎকার করে গালি দিতে লাগলো আর চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, "মেরে ফেল, কুটে মাটিতে মিলিয়ে ফেল বদমাস্‌কে।"

কিন্তু মেঘরাজ তখন দাওয়াইয়ের গুণে আর তার নিজের অতোদিনের রাগে দুঃখে দুর্জয় হয়ে গেছে। তার দু'হাত্তা ডাণ্ডাব মার সামলাবে কে? একদিকে কতগুলো বেইমান নিমক-হারাম লোক, অন্যদিকে একজন বেপরোয়া লোক,—অত্যাচারে, রাগে, দুঃখে মরিয়া হয়ে, তার ধরম্ আর হকের কথা মনে করে শেষ লড়াই লড়্‌ছে। তার সঙ্গে আছে এক বুঢ়া দুঃখের দুঃখী সাথী, সে পিছনের চোরা মার বাঁচাচ্ছে।

"ধরম কি কল্ হাওয়ায় হিলে।" আর এ তো হাওয়া নয়, যেন তুফানের ঝড। ডাণ্ডা বন্‌বন্ ঘুর্‌ছে, দাঁহিনে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে, তার সঙ্গে চল্‌ছে মেঘরাজের তাণ্ডব নাচ আর গর্জন। সে যেন শিয়ালের পালে বব্বর সিংঘি ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দুলারীর আর তার দলের সকলের সামনে এক আজব লড়াইয়ের দঙ্গল উল্টা রকমে ফিরে গেলো। যারা গালি দিচ্ছিল তারা সেই তাজ্জব ব্যাপার দেখে প্রথমে চুপ হয়ে হাঁ করে দেখ্‌লো, তারপর, "হায় হায়, সত্যানাশ হয়ে গেলো" ব'লে বুক মাথা চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। শুধু দুলারী চুপ করে দেখতে লাগলো কি হয়।

বিশ মিনিটের ডাণ্ডাবাজীতে টিট্ হয়ে গেলো যত লোক, আর মালীর চীৎকারে তারা বুঝলো যে মনিব ফিরে দখল নিতে এসেছে। তখন সকলে মাটিতে শুয়ে-বসে হাতজোড করে মাফ চাইতে লাগলো। শুধু অনুসূয়ার দুই ভাই ছেলেপিলে সমেত পালিয়ে গেল মহালের অন্দর-মহালে, লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে। মেঘরাজের কাপড়া জামা ছিঁড়ে গেছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধূল-রক্ত মাখা। কিন্তু চেহারা দেখাচ্ছে যেন লড়াইয়ের ময়দানে মহাবলী মহারাজ। সে কোনও

দিকে না তাকিয়ে চল্লো মহালের ভিতর সকলকে কায়দা কাবু কর্‌তে। ঢুকেই প্রথমে তার সামনে এলো দুলারী অনসূয়া।

দুলারী সবকিছুই দেখেছে। দেখেই তার তামাম বিমারী দুরুস্ত, অন্য কিছুই কর্‌তে হোলো না। সে এগিয়ে এসে বল্লে, "আয়েও মেরে রাজা!" ব'লে মেঘরাজের সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম কর্‌লে, আর তারপর তার হাত ধরে নিয়ে গেল ভিতরের দাওয়ায়।

সেখানে চৌকিতে বসিয়ে, তার জুতা খুলে, দুলারী আর তার মা, ভাবী সবাই মিলে, মেঘরাজের হাত পা বদন ধুয়ে, মুছে, সাফ করতে লাগলো।

এইরকমে ঐ অত্তোদিনের মহাপাতক দেড় দণ্ডের মধ্যে বিলকুল সাফা হয়ে গেল, ঠিক যেন ভানুমতির খেল!

"ইয়ে দেখো হকীম হুড়ুকবাজকী দাওয়াই!"

গল্পশুনে সবাই চুপ। একটু পরে মণ্টু তার সরু গলায় বল্লে, "আর সেই, গুজরাটি মোষের বাচ্ছার মত, সেই যে সুন্দরীয়া, তার কি হোলো?"

জমাদার হেসে বল্লে, "সে?—সে তো এখনো বসে আছে হামার মণ্টুদাদাকে সাদী কর্‌বে বলে"—

মণ্টু বল্লে, "ধ্বেৎ"—
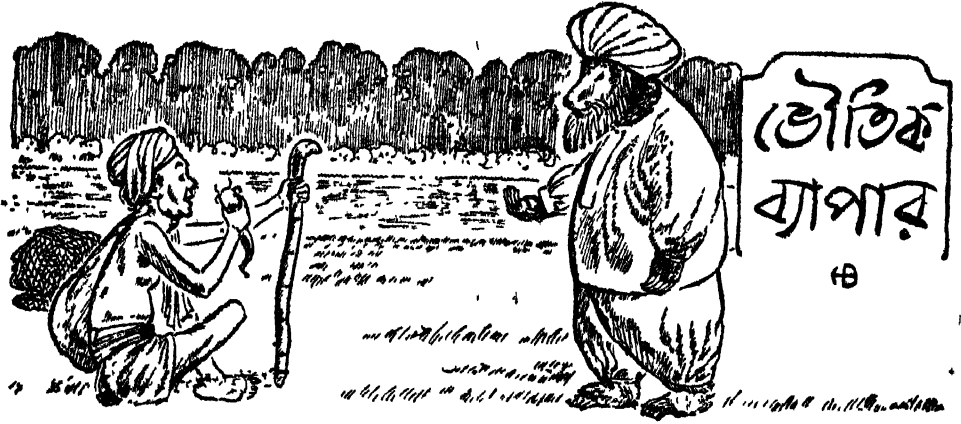
শিপ্রা নদীর এই পারেতে বিপ্রদাসের খুড়ো
আনমনেতে চিবুচ্ছিলেন শিঙ্গিমাছের মুড়ো
হঠাৎ এলো ওপার হোতে হুতুমথুমো বুড়ো ॥
খ্যাংরা-খোঁচা চুল দাড়ি তার নোংরা কাপড় জামা
মাথা জোড়া পাগড়ি যেন শিমুল তুলোর ধামা
চেহারাতে ঠিক যেন সে জাম্বুবানের মামা ॥

হুতুমথুমো বলে আমি টহিলরামের দাদা
টহলদারি করে হোলো চুল দাড়ি গোঁফ সাদা
সাতজন্মেও দেখিনিকো তোমার মতন হাঁদা ॥
জানোনাকি সকাল সাঁঝে মাছধরার ফিকিরে
বাজিয়ে তালে লাক্‌বঙাবঙ্, নেচে ঘুরে ফিরে
ও্ঁড়েলা ভূত হাম্‌লে বেড়ায় এই নদীর তীরে ?
সকাল সাঁঝে মাছ ধরে খায় মেছো ধরে রাতে
মাছ চিবুনো বেরিয়ে যাবে পড়্‌লে তাদের হাতে
যেই দেখেঙ্গা সেই খায়েঙ্গা, সন্দেহ নাই তাতে ॥

বলেন খুড়ো, আমার গুরু বজ্রবাঁটুল সাঁই
ভূত পতরী বেচা-কেনায় তেনার দোসর নাই
কারবারে তাঁর রকমারী চালানীভূত চাই ॥

মার্কিনিয়া তুর্কিনাচন জানা 'পরমানা' ভূত চায়, সেজন্য খুড়োর গুরু ব্রজবাঁটুল সাঁই দাঁড়িয়ে মার্কিন খরিদ্দারকে নমুনা দেখাচ্ছে। নাচিয়ের হাতে দাম লেখা ঝুলছে।

মার্কিনে চায় "পরমানা" ভূত তুর্কিনাচন জানা
হাঙ্গেরী চায় শিঙ্গেলা ভূত মুঙ্গেরী গো-দানা
হলাণ্ডে চায় পলাণ্ডুখোর মাম্‌দো ভূতের ছানা ॥
ভূতধরার ফিকিরে ঘুরি হুতুমথুমো ভাই
শুঁড়েলা ভূত চুড়েলা ভূত সবরকমই চাই
বাতলিয়ে দাও কোথায় গেলে তাদের নাগাল পাই ॥

ভৌতিক ব্যাপার

বংশলোচন বাঁশের খেঁটেয় প্রেতবিমোচন বলে
ভূতের বাবাও ঢিট্ হ'য়ে যায় এরি দু'ঘা দিলে
বাঁশের যাদুর কতই মধু, দেখাই হাতে পেলে ॥
রামটেকোতে কাটা সুতোব তন্ত্র বুনট জাল
এই জালেতে পড়লে ধরা ভূতের ঘনায় কাল
মন্ত্র পড়ে থলেয় দিলেই হয় চালানী মাল ॥
ভূতের বাজার বেজায় তেজী, শুন মহাশয়,
আসবে ডলার চালান দিলে, করহ প্রত্যয়
দেখেঙ্গা তো ধরেঙ্গা হাম্ আর বেচেঙ্গা নিশ্চয় ॥

মামদো শিঙ্গেল ও শুঁড়েলা ভূতের একত্র সমাবেশ ঘটেছে।

হুতুমথুমো বলে এ তো বেজায় জুলুমবাজী
আদমী ধরে ভূত পতবী, অজিব এ কারসাজী !
নিরীহ ভূত ধরিয়ে দিতে নেই হোয়েঙ্গা রাজী ॥
ভাগ্ যাও হো, শুঁড়েলা ভূত , হুন্দর-এ বঙ্গাল
ইথে আয়া, তুমকো ধরে করবে টালমাটাল
ভাগেঙ্গা হম্, তুমভি ভাগো, দূবে থাক জঞ্জাল ॥

নদীর ওপার পেলিয়ে গেলো হুতুমথুমো বুড়ো
শিপ্রা নদীব এই পারেতে বিপ্রদাসেব খুড়ো
উদাস মনে চিবিয়ে খেলেন শিঙ্গিমাছের মুড়ো ॥